উৎস মানুষ

৩১ বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি ২০১১

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
সুন্দরবন: পুরোটাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে	তুষার কাঞ্জিলাল	২
বাঁশিওয়ালা	তুষার কাঞ্জিলাল	৪
গোপাল গণেশ আগারকার	জি পি প্রধান	৫
মুর্শিদাবাদে কাঁসা-পিতল শিল্প:অতীত ও বর্তমান	সুনীতিকুমার মণ্ডল	১৩
অ্যাম্বুলেন্স যখন ব্যবসা	ভবানীপ্রসাদ সাহু	১৯
সেতারের জোয়ারি	সিদ্ধার্থ রায়	২২
মানুষ গড়ার কাজে বাজিরাউত ছাত্রাবাস	নিরঞ্জন বিশ্বাস	২৪
প্রতিবাদের আরেক নাম: শর্মিলা চানু	পূরবী ঘোষ	২৫
নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন	পূরবী ঘোষ/ অরুণ পাল	২৭
চিঠিপত্র		২৯
আমরা কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী	ষড়ানন পণ্ডা	৩১
সংগঠন সংবাদ		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক,কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/
৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush.manush@gmail.com

আমাদের কথা

সম্প্রতি বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে যার জন্য আমরা বেশ মনোকষ্টে আছি। বেশ রেগেও। তার অন্যতম হল ডাক্তার বিনায়ক সেনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ভদ্রলোক যে অপরাধ করেছেন, তাতে তাঁর কয়েকবার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। আর দেওয়া হল— সামান্য যাবজ্জীবন! উনি যে অতি মারাত্মক অপরাধ মাওবাদী চিঠি চালাচালি করেছেন তার কাছে নস্যি! আমাদের দেওয়া টাকায় ডাক্তার হলেন, কোথায় শহরে থেকে আর পাঁচজন চিকিৎসক যেমন চার-পাঁচশো টাকা ভিজিট নিয়ে, রোগনির্ণয় কেন্দ্রের কমিশন নিয়ে, নার্সিংহোম ব্যবসায়ে যুক্ত হয়ে আমাদের শহরে ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা করবেন, না উনি গেলেন কতগুলো হাঘরে-হাভাতের জন্য প্রাণপাত করতে। 'ছোটলোকদের' সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে, দাবিদাওয়া সম্পর্কে সচেতন করতে। একবার হাজত এবং কালকুঠুরিতে রাখাতেও শিক্ষা হয় নি! রাষ্ট্র কত যত্ন আর নিষ্ঠায় যা কায়েম রেখেছে, তার বিরুদ্ধে যাওয়া তো মারাত্মক রাষ্ট্রদ্রোহ। সেই মারাত্মক অপরাধের শাস্তি শুধু যাবজ্জীবন! ওঁর প্রাণদণ্ড না হওয়ায় আমরা খুবই হতাশ, ক্রুদ্ধ।

দ্বিতীয় হতাশার কারণ বাঙালির আইকন সৌরভ গাঙ্গুলির আই পি এলে সুযোগ না পাওয়া। ছেলেটা খেলে সামান্য কটা টাকা পেত, তা থেকে বঞ্চিত করে ওর, এবং তাবৎ বাঙালির ক্ষতি করেছে। এই বাজারে কয়েক কোটি টাকায় কারও চলে! ছেলেটা আই পি এলে খেলবে বলে রনজি ক্রিকেটে নতুনদের সরিয়ে ঢুকেছিল তো শুধু আই পি এলে খেলার জন্যই, হাতটা ঠিক রাখতে। হোক না পাঁচ-ছটা দেশের মধ্যে খেলা। তবু মনে রাখতে হবে আমরা বিশ্বে তিন-চার ক্রমে আছি। একবার বিশ্বসেরাও হয়েছি। 'দাদাগিরি'র মূর্ত প্রতীক সৌরভ। ওর লড়াকু মানসিকতা, দেশের জন্য সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে আত্মত্যাগ—আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। লর্ডসে জামা খুলে ওড়ানোর ছবিটা আমাদের মনে গেঁথে আছে। মাদুলি, তাবিজগুলো বেরিয়ে পড়েছিল, তা যাক। আপাদমস্তক কুসংস্কার? সে কার না থাকে! তবু আমাদের দাদা তো! দাদাকে আমরা স্কুল গড়তে সল্টলেকে জায়গা দিয়েছি, রাজারহাটে রাস্তা গড়েছি, তাকে কিনা আই পি এলে বাদ দেওয়া! আমরা আর খেলাই দেখব না!

এতো সামান্য কটা টাকা, ডজনখানেক গাড়ির বিনিময়ে আমাদের ক্রিকেটার দেশের জন্য যে আত্মত্যাগ করে—তা টাটা-বিড়লা ছাড়া কজন পারে। আমরা দেশের জন্য কিছু করতে পারি না! যারা করে তাদের বঞ্চনায় আমরা মর্মাহত হই, ক্রুদ্ধ হই।

সম্পাদকমণ্ডলী

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

সুন্দরবন: পুরোটাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে!

তুষার কাঞ্জিলাল

সুন্দরবনটা কি। সুন্দরবনটা তো বন। কেউ বলতেন এককালে প্রকৃতি এটাকে একটা বন হিসাবে সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষে একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। সুন্দরবনের দুই তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে, ১০২টা দ্বীপ ভারতে, বাকিটা বাংলাদেশে। এখন এই যে জঙ্গলটা গড়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের কিছু নদী নিয়ে। গুয়াসাবা জামিরা, সপ্তমুখী বড় বড় নদী দিয়ে জোয়ারে প্রচুর জল ঢুকতো এবং ভাটায় বেরিয়ে যেত। ওখানকার প্রত্যেকটা নদী পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গেপসাগরের সঙ্গে যুক্ত। এই জোয়ারে জল ঢোকার সময় কিছু বাধার সৃষ্টি হত। পলি পলি টানে এবং ধীরে ধীরে উঁচু হতে থাকে, এটা মানুষ ঠিক করে না, ঠিক করে চন্দ্র সূর্য। তখন সেটা জমতে শুরু করে। প্রকৃতির নিয়মেই এই দ্বীপগুলি গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতির ইচ্ছে অনুযায়ী এই দ্বীপগুলি সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে বন্যপ্রাণীরা বাস করবে। বট অশ্বত্থের মতো বড় বড় গাছ নয়। সেগুলি হল ছোট ছোট গাছ যাকে ম্যানগ্রোভ (বাদাবন) বলা হয়। ম্যানগ্রোভ গাছগুলি যাতে টিকে থাকতে পারে, বেঁচে থাকতে পারে, তার মতো অবস্থা করেই এই জঙ্গলগুলির সৃষ্টি হয়েছে। এই যে পলি জমে দ্বীপ হওয়া, এটা প্রথম দিকে খুব দ্রুত লয়ে হয়। দ্বীপটা প্রথম ২০ ফুট জমি যদি ৪ বছরে জমে থাকে, তাহলে পরের ২০ ফুট হয়তো ২০ বছরে জমবে। একটা সময়ে ব্রিটিশ সরকারের মনে হল, এই যে বিরাট অঞ্চল, এর থেকে তো আমাদের আয় হচ্ছে না, আমরা খাজনা পাচ্ছি না! তারা ঠিক করল জমিটাকে জরিপ করাবে। তারা একটা কাল্পনিক রেখা টানল তখনকার যশোর ডিভিসনে। একটা জরিপের কাজ করেছিল এবং এই দ্বীপগুলিকে ওরা ইজারা দিতে শুরু করে। দিল কাদের? দিল অনাবাসী জমিদারদের যারা কেউ সুন্দরবনে পা রাখেন নি। যেমন মেদিনীপুরের ইলা পালচৌধুরীর মতো পরিবার। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন এদের ইজারা দিলেন। এক একটা মঠ ইজারা দিলেন। এই সুন্দরবনে গড়ে ওঠা কিছু মানুষের লোভ, কিছু মানুষের এখান থেকে শুষে কিছু বাড়তি উপার্জন করা, এটাই কিন্তু মূলত কাজ করেছিল। অতএব যারা লিজ দিলেন, তারা আয় করবার জন্য রায়ত বসাতে শুরু করলেন। এই রায়ত

বসাবার কিছু পূর্বশর্ত ছিল। সুন্দরবনের সমস্যার মূল হচ্ছে যে জোয়ারে এই সুন্দরবনের জল ২০-৩০ ফুট উপরে ওঠে আবার ভাঁটায় নেমে আসে। সেখানে বসতি করতে গেলে যখন পূর্ণ জোয়ার দ্বীপের মধ্যেকার যে মাটি সেটা প্রায় ২ ফুট থেকে ২.৫ ফুট নিচে থাকে অর্থাৎ সুন্দরবনের মানুষ জলের তলায় চলে যাবে। প্রথম সর্বনাশ করা হয়েছিল দ্বীপগুলি যতটা উঁচু হলে বসতি গড়া যেত তার অনেক আগেই বসতি গড়ে তোলা হয়েছিল। ইংরেজ সরকার ও জমিদাররা চেয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহারা মানুষ যারা বেশির ভাগটাই এসেছে যশোর খুলনা অর্থাৎ পৌন্ড্রক্ষত্রিয় এবং মেদিনীপুরের একটা বিরাট অংশ। এই দ্বীপে বসতি গড়তে গেলে প্রথম পূর্বশর্ত ছিল প্রথমত দ্বীপের জঙ্গল ধ্বংস করতে হবে তা না হলে মানুষ বাস করতে পারবে না। সাপও আছে, মানুষও আছে, বাঘও আছে সেটা তো হতে পারে না। সমস্ত বন্য প্রাণীদের তাড়িয়ে দিতে হবে। বাঘেরা আজকাল সুন্দরবনে জনবসতিতে ঢুকে পড়ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে

ওদের সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার। আজ থেকে ১৫০ বছর আগে এই লড়াইটা কিন্তু ১৩০ কিমি মধ্যে মানুষ জঙ্গল ধ্বংস করে দিয়ে মানুষের আবাদ গড়ে তুলছিল। এটা প্রকৃতি বিরোধী কাজ। মূল হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতা করে থাকতে দিয়েছে। এই জঙ্গল হাসিল করার জন্য সাঁওতাল পরগনা থেকে আদিবাসীদের ওখানে নিয়ে এসে তারা জঙ্গল হাসিলের কাজটা করেন। ২য় কাজটা হচ্ছে এই যে জোয়ারে জল দ্বীপের থেকে ৩-৪ ফুট উপরে ওঠে বাড়তি জলকে দ্বীপে ঢুকতে দেওয়া হলে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় দুবার নোনাজলের প্লাবন বয়ে যাবে। একটা ঘাসও জন্মাবে না,মানুষের পক্ষে বাস করা অসম্ভব, এই বাড়তি জলকে আটকাবার জন্য তখন জমিদাররা ঠিক করলেন দ্বীপটাকে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে। অর্থাৎ যতটা জল উপরে থাকে তার থেকে একটু ওপর পর্যন্ত। এখন পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনে ১০২টি দ্বীপ, তার মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপের পুরোপুরি জঙ্গল হাসিল করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রায় ৪৭ লক্ষ লোক বাস করত। কাজ হাসিল করা হয়েছে। মাত্র ৪৮ টা দ্বীপে ফরেস্ট কভার আছে। এখন দেখা যাচ্ছে স্যাটেলাইটে যে ৫৪ টি দ্বীপ তার দুটো দ্বীপকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গুয়াবাধা অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু জায়গা ছিল, এখন সেখানে ৫০০-১০০০ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁধ যে তৈরি হল তাতে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনিক্যাল স্কিল ছিল না। একই জলে দুবার ডুব দিতে পারা যাবে না। এর মধ্যে যে বিচিত্র ক্রিয়াপ্রক্রিয়া চলছে তার ভাবনা চিন্তা তারা করে নি। ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ দেয়া হয়েছে। এখানে দুটো সর্বনাশা দিক ছিল, প্রকৃতি ১০২ টি দ্বীপ তৈরি করেছিল মানুষ বাস করার জন্য। আমরা তার অর্ধেকেরও বেশি জায়গা কেটে সাফ করে দিলাম। সুন্দরবনের যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এর একটা প্রধান কারণ কাজ ছিল এই যে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ হয়, তারপর যে ঘূর্ণিঝড় হয়, সেই ঘূর্ণিঝড়ে প্রথম ঝড়ের ধাক্কা জঙ্গল সামলাত। এখন অর্ধেকের বেশি জায়গা জঙ্গল সাফ করে দিয়ে ঘূর্ণিঝড়কে দরজা পর্যন্ত রাস্তা করে দেয়া হল। ৮৮ সালে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, কিন্তু আয়লার ঝড়ের সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। আমরা পশুপাখি আর বন্যপ্রাণী তাড়িয়ে দিয়ে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করলাম। বাঁধ দিয়ে দেওয়া হল সেখানে। তারপর বাদা জঙ্গলগুলো ফাঁকা করে দেয়া হল। এই তিনটে সর্বনাশা কাজের ফলে আগামী ৩০-৪০ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা বিজ্ঞানীদের মত। সুন্দরবনের নদীবাঁধ যেটা সবচেয়ে বেশি জ্যান্ত সমস্যা। এই ৩৫০০ কিমি নদীবাঁধগুলি স্বাধীনতার এত বছর পরেও বৈজ্ঞানিকভাবে সমীক্ষা করে, কি ধরনের বাঁধ হওয়া উচিত পরীক্ষা করে, তারপর ভাবতে হবে একেবারে নদীর ভাঁটায় যে জল আসে এর লেভেলটা কি থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে বাঁধ কোথায় কোথায় ভাঙনের সম্ভাবনা আছে। এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন আসে। নদীবাঁধের ভাঙন হয় কেন? দুটো কারণে, চওড়া নদীতে সমস্ত ক্ষণ বাতাস বইছে সেটা আসতে গিয়ে বাঁধকে ধাক্কা দিচ্ছে। বছরের পর বছর যদি ধাক্কা দিতে থাকে সেটা দুর্বল হয়ে পড়ে, কোনো দুর্যোগে সে বাঁধ ভেঙে যায়। বাঁধের উপর দিয়ে জল উপচে পড়ে বন্যা ঘটাতে পারে। বাকি সবটাই ভাঙে স্রোতের কারণে। স্রোতের কারণ কি? যখন বঙ্গোপসাগর থেকে বড় বড় নদী গুলি দিয়ে জল ঢোকে তীব্র গতিতে ঢোকে, জলটা ভেসে ভেসে ঢোকে না, এটা নদীর তলায় একটা খাল তৈরি করে ঢোকে। আমাদের দ্বীপের মুখেই প্রচণ্ড খাল করে ঢুকে যায়, এখন এই যে খালটা সে তৈরি করে যতদূর পর্যন্ত সে জলটাকে বয়ে নিয়ে যায় ততদূরই এই খালটা সে তৈরি করে। আবার ভাঁটার সময় এক খাল দিয়ে জল বার করবে। যখন সমুদ্রে ফিরে যায় তখন সমুদ্রে যেখানে নদী চওড়া সেখানেসরু আঁকাবাঁকা হয়। এখন দেখা গেল প্রাকৃতিক নিয়মে হঠাৎ অনেকগুলি নদী দিয়ে ঢোকাচ্ছে। একটা নদীতে প্রাকৃতিক নিয়মেই বাধার সৃষ্টি হল। এই নদী দিয়ে জল ঢুকতে বাধা পাচ্ছে তখন সে পাশের নদী দিয়ে জল ঢোকাচ্ছে। যতটুকু জল বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ততটুকু জল তারা বার করতে পারে। একটা নদী দিয়ে জল ঢুকতে যে বাধা পাচ্ছে, সেটা পাশের নদী দিয়ে ঢোকাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বাঁধটাকে চিনতেই পারল না। আয়লাতে ৩৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে ৭৭৮ টা বাঁধ ভেঙে গেছে। অশোকবাবু বেঁচে থাকলে বোধহয় এই নিয়ে আন্দোলনে নেমে পড়তেন। সুন্দরবনের আবহাওয়া মণ্ডল পরিবর্তন হয়। গোটা পৃথিবী জুড়ে ভোগের পাগলামি চলছে। আজকের পৃথিবীতে কর্মক্ষম প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই নিরাপত্তা এমে দেওয়া যেতে পারে যদি তারা ৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করে তাহলে লোকের কোনও অভাব থাকবে না। প্রত্যেকটি মানুষকে এই যে আবহাওয়া মণ্ডলের যে পরিবর্তন ঘটছে সেটা সকলেই জানে। ধনী দেশগুলো বিপদে পড়ে তাদের নিজস্ব সংঘাতের ফলে একটা যুদ্ধ বাধায়, ফলে ধ্বংসটা আমাদের বেশি হচ্ছে। আয়লা হচ্ছে শেষ নয়, এটা হচ্ছে শেষের শুরু। আমরা নিজেরাই সুন্দরবনকে ধ্বংস করছি।

বইমেলায় নতুন আঙ্গিকে
‘বিবেকানন্দ অন্যচোখে’-র
নতুন সংস্করণ বেরোল
দাম ১০০.০০

বাঁশিওয়ালা

তুষার কাঞ্জিলাল

উৎস মানুষ একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কিছু সৎ এবং বিবেকবান মানুষ জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতার সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। একবিংশ শতাব্দীতেও নানা ধরনের কুসংস্কার, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষদের মনে ভিত গেড়ে বসে আছে। ওঝা, গুনিন, জরিবুটি, তন্ত্রমন্ত্র—এসবের দাপাদাপি গ্রামে এবং শহরে গরিব মানুষদের জীবনে নানা সর্বনাশ ডেকে আনছে। তাদের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনা গড়ে তোলা অনেক কষ্টসাধ্য। উৎস মানুষ এবং এই ধরনের কিছু কিছু সংগঠন নানাভাবে এই সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সীমিত পরিধিতে হলেও কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রয়াস সাহায্য ও প্রশংসার দাবি রাখে। উৎস মানুষ কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতের পীঠস্থানে তাঁদের প্রতিষ্ঠাতা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা করার জন্য ডেকেছিলেন।

সভা শুরু হয়েছিল প্রচলিত রীতির বাইরে একটা ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে। ওরা একজন বাঁশিওয়ালাকে ধরে নিয়ে এসেছিল। এই বংশীবাদক সাংস্কৃতিক জগতে কোনও প্রতিষ্ঠা পাননি। যাদুঘরের সামনে বসে তিনি পেটের ভাত জোটাবার জন্য সারা দিনমান বাঁশি বাজিয়ে কিছু অর্থ রোজগার করেন। তাঁকেই তারা অনুষ্ঠানের প্রথমেই তাঁর বাঁশি শোনাবার সুযোগ করে দিয়েছিল। সে বাঁশির সুর আমাকে কিছুটা নস্টালজিক করে তুলেছিল। ভিন্নতর পরিবেশে এ বাঁশির সুর হয়ত মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারত। আমার মনকে আর একজন বংশীবাদকের স্মৃতি ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। সেক্ষেত্রে আবহাওয়া ছিল ভিন্ন ধরনের। গভীর নিশুতি রাত, ভরা পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার আলো—একটা স্বপ্নিল পরিবেশ প্রকৃতিকে ঘিরে এবং ভরে আছে। আমার বাসগৃহ হচ্ছে বিদ্যানদীর চরে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীরা হচ্ছেন আদিবাসী, ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোক। নগেন সর্দার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের একজন। না খাটলে যার একমুঠো ভাত জোটার কথা নয়, তার শখ দীনমান বাঁশিতে সুর তুলে পথ চলা। সংসার বলতে একা মনিষ্যি। এক সময় স্ত্রী-পুত্র যা যা থাকার কথা সবই ছিল, তারা নগেনকে ছেড়ে বেঁচেছে। যেদিন নগেনের দু-বেলা পেটে কিছু পড়ত এবং রসেবসে থাকার উপাদান গলায় ঢালতে পারত, সেদিন মধ্য রাত্রে ধবধবে জ্যোৎস্নায় নদীর বাঁধে বসে নগেন বাঁশি বাজাত। সে বাঁশির সুরে আমার ঘুম ভেঙে যেত। তার সুরে কী জাদু ছিল জানি না। কিন্তু সে সুর শুনতে শুনতে দেহমন সব অসাড় হয়ে যেত। স্বর্গীয় সৌন্দর্য বলতে কী বোঝায় আমি জানি না। সেই সুর আমাকে ঘরের বাইরে করে ছাড়ত এবং গুটি গুটি পায়ে ধ্যানমগ্ন নগেন বাঁশিওয়ালার একটু ফারাকে চুপচাপ বসে থাকতাম। একটা সময়ে মনে হত এই অসহনীয় সুর ও সৌন্দর্যের মধ্যে আমি বিলীন হয়ে গেছি। জোয়ারে জল বাড়ছে, নদী পূর্ণ যুবতীর রূপ নিচ্ছে, চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু জল তরঙ্গের একটানা একটা শব্দ। ঝুপঝাপ রাক্ষুসী নদী বাঁধের মাটি গিলে খাওয়ার অশ্লীল শব্দ। বোধহয় এই রকম ক্ষেত্রেই মনে হয় আমি এবং প্রকৃতি এক। এই সুর, শব্দ, জ্যোৎস্নার আলো, গাছের সার—এ সবের মতো আমিও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এমন একটি রাত্রের পর দিনের বেলায় আকাশ থেকে যেন মাটিতে পড়লাম। সর্বগ্রাসী নদী নগেনের ঝুপড়িটাকে ধস নামিয়ে গ্রাস করে ফেলেছে। নগেনের মধ্যে কোনও হেলদোল দেখলাম না। মরা গরিবের কি কোনও বাস্তু থাকে। ঝ্যাঁতলা মাদুর আর শতচ্ছিন্ন একটি কাপড়ের পুঁটলি ছাড়া কোনও আসবাবের বালাই নেই। নগেনের হারাবার কিছু নেই, তাই হেলদোলও নেই। কিন্তু ঘরের মধ্যে তার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি ছিল তা হারিয়ে তার আকুল কান্না। সম্পদটি সেই বাঁশি। যে বাঁশিতে যে চার দশক সুর সৃষ্টি করে তুলেছিল, আমি ওকে ডেকে বললাম কলকাতা থেকে একটা ভাল বাঁশি আমি এনে দেব। কিন্তু সেদিন থেকে নগেনকে নিশ্চুপ পাথর হয়ে যেতে দেখলাম। তার আচার-আচরণে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। সে শুধু কেঁদে যায়। অন্ন তার মুখে রোচে না এমনকি যে রসে সে বিভোর হয়ে থাকত সে রসও ছোঁয় না। সারা দিনমান পাগলের মতো ছুটে বেড়ায় আর রাতে আমার ঘরের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে ভূমিতে শয্যা নেয়। ধীরে ধীরে ওর নাম পাল্টে হয়ে গেল নগেন পাগল। রাস্তার ছেলেরা ঢিল ছোঁড়ে, অন্য গৃহস্থরাও দাওয়ায় একটু বসলেই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আমি ওর পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করি, বাকি সকলকে বোঝাই, তারা গুনিন দিয়ে ঝাড়াবার ব্যবস্থার নিদান দেয়। একবার জোর করে ওকে কলকাতায় এনে একজন মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখাবার ব্যবস্থা করলাম। ও বাইরে বসেছিল, আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে দেখি নগেন নেই। সে এই শহরে শত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল আজও জানি না। হয়ত বা তার একমাত্র সম্পদ বেঁচে থাকার একমাত্র রসদ বাঁশিটিকে আজও খুঁজে চলেছে। **আজকাল ২৮.১১.২০১০**

অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন, লড়াকু

গোপাল গণেশ আগারকর

(১৮৫৬ - ১৮৯৫)

জি পি প্রধান

মূল মারাঠি থেকে ইংরেজি ভাষান্তর - ড. অশোক আর কেলকার

বাংলা ভাষান্তর - প্রতুল মুখোপাধ্যায়

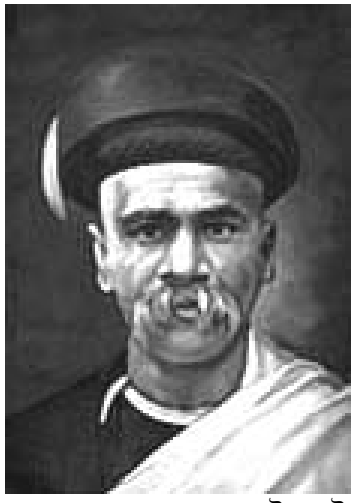

সাধারণভাবে বলা যায় রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক অভিযান আর নাটকীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের কল্পরাজ্যের দখল নেওয়ার উপায় নেই সৃজনধর্মী চিন্তাশীল মানুষদের। বীরেরাই ওভাবে সমসাময়িক ও নিকটতম উত্তরসূরিদের অনুপ্রাণিত করেন। যাই হোক, এই সংগ্রাম একবার শেষ হয়ে গেলে ওই বীরত্বের কাহিনীর পক্ষে নিতান্তই পড়ার ঘরে বসে চুপচাপ কাজ করে যাওয়া কোন চিন্তাশীল মানুষের সাদামাটা জীবন-কাহিনীর তুলনায় বেশি সময় জনসাধারণের আগ্রহ ধরে রাখা শক্ত। তবে যে সব চিন্তা সামাজিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে সে সব কিন্তু সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রভাব রেখে যায়। এ কথাটি মনে রাখা বিশেষ করে প্রয়োজন ভারতের মত বীরপূজার জন্য বিখ্যাত দেশে, আরও বিশেষ করে আধুনিক ভারতে যেখানে জননেতারা কেমন শক্ত করে জনচিত্ত ধরে রাখেন; জনগণের স্বাধীনতার জন্য আকুলতা আর জননেতাদের জাতীয়তাবাদী শিক্ষাদান— এ দুইয়ের সামঞ্জস্যের জন্য এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক। জনচিত্তজয়ে বা তাৎক্ষণিক অভিঘাত সৃষ্টিতে সমাজবিপ্লবীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা চেষ্টা করছিলেন জগদ্দল হিন্দুসমাজটাকেই নড়াতে। তবে এই বৌদ্ধিক আক্রমণের তীব্রতা ছিল এতই বেশি যে তা সমাজের নানা স্তরের মানুষকে জাগিয়ে তুলল, আর সূচনা হল সমাজপরিবর্তনের এক প্রক্রিয়ার। আজ ভারতীয় সমাজ এই সমাজবিপ্লবীদের কাছে ঋণস্বীকার করছে, কারণ তাঁদের শিক্ষা মোটেই বিস্মৃতিতে বিলীন হয়নি, বরং আজকের সমাজজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

কাল যা ছিল স্বপ্ন, আজ তাই বাস্তব। তখন যা ছিল দুঃসাহসিকভাবে গোঁড়ামিবিরোধী, তাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সময়ের রীতি— সে রীতি সত্যিই এতই চেনা যে কেউ কখনও, এ বিষয়ে আগে যা বলা হয়েছিল তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ঠাহর করে উঠতে পারে না। কেউ পারে না বলা হল অবশ্য সামাজিক ইতিহাসে আগ্রহী মুষ্টিমেয় বিদ্যার্থীদের বাদ দিয়ে। যে সমস্ত চিন্তক কোন সমস্যা যখন যেমন চোখে পড়েছে, তখনই তার মোকাবিলায় ব্যস্ত থেকেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এমন ব্যাপার অনিবার্যভাবেই ঘটে থাকে। শুধু নতুন সমাধান উদ্ভাবনই নয়, সমস্ত ধরনের সমস্যার সমাধানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বা কর্ম প্রক্রিয়ার চয়ন— এ সব কাজ খুব কম মানুষের জন্যই থাকে। সমস্যা বদলাতে পারে, কিন্তু সমাধান প্রক্রিয়া প্রবর্তনের সময় যেমন ছিল, পরেও তেমনই প্রাসঙ্গিক থেকে যায়। প্রয়াত গোপাল গণেশ আগারকরকে অন্যদের থেকে যা দিয়ে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় তা হল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক সমস্যাকে বাগে আনার কৌশল।

তাঁর জীবনে আবেগময় কল্পনার জ্যোতি [romantic halo] ছিল না ঠিকই, তবে সংঘর্ষ আর সংগ্রামের ভাগে কমতি ছিলনা মোটেই। তাঁর বোধ বা ধারণা শুধুই একাকী ধ্যান বা চিন্তার ফসল ছিল না। তা গড়ে উঠেছে তাঁর নিজের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে, সব রকমের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর সদাপ্রস্তুত অবস্থান থেকে— অবশ্য সব কিছুরই কেন্দ্রে ছিল তাঁর উপলব্ধিসমৃদ্ধ আস্থা [comprehending credo]।

তাঁর ভাবনার দিকে তাকাবার আগে তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনের

কিছু মুখ্য ঘটনার কথা আর একবার ঝালিয়ে নিলে সুবিধে হবে। সাতারা জেলার তেম্‌ভু নামে এক গ্রামের খুবই গরিব এক পরিবারে ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিনি তহসিল সদর করহদে চলে আসেন দাদু-দিদিমার সঙ্গে থাকতে। সে সময়টা কেটেছে কখনও কৃষ্ণা নদীতে সাঁতার কেটে, সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করে, কখনও বা হাতের কাছে কোন বই পেলেই দু-মলাটের মাঝখানে যা আছে সব পড়ে শেষ করে। মাধ্যমিক স্কুলের পড়া শেষ হল। ছোট ছেলে আগারকরের সামনে তখন এক মন-খারাপ-করা ভবিষ্যৎ--- তহসিলদারের অফিসে কেরানিগিরির শিক্ষানবিশি। অস্থির আগারকর করহদ ছেড়ে চলে গেলেন জেলা শহর রত্নগিরিতে। মনে আশা, যদি সেখানকার আত্মীয়দের সাহায্যে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়া যায়। কাজ হলনা কিছুই, লোকের দয়ার উপর নির্ভর করে টিকে থাকতে হল। দিনের পর দিন কষ্ট বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হল করহদে--- এক ডাক্তারের কাছে বড়ি পেষাই আর গুঁড়ো করার কাজ নিয়ে— আগাগোড়া অপছন্দের কাজ।

তাঁর মামিমা বেড়াতে যাচ্ছিলেন বিদর্ভেরআকোলায়। অপ্রত্যাশিতভাবেই সঙ্গে পাঠান হল তাঁকে। এখানেই তাঁর স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করলেন ১৮৭০ সালে। সেখানেই সে সময়ের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন ও লেখক বিষ্ণু মোরেশ্বর মহাজনী-র মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন এক মরমী ও গুণী শিক্ষককে। মহাজনীর সস্নেহ যত্নে গোপালের মেধা যেন ফুলের মত ফুটে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল সদ্য-দেখা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। বলা যায় গুরুর জেদেই সেই মেধার প্রকাশ হল তখনকার নতুন মাধ্যম মারাঠি গদ্যে, মারাঠি নব্যবুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বাহন ইংরেজিতে নয়। শুরু হল এক নতুন লড়াই। তাঁর শিক্ষকেরা ষাট টাকা চাঁদা তুলে তাঁকে পাঠালেন পুনা-য় [বর্তমান:পুনে- অনুবাদক] ডেকান কলেজে উচ্চতর শিক্ষার জন্য। হার-না-মানা লড়াই চলল পাঠক্রম শেষ করতে। খবরের কাগজের জন্য লেখালেখি করে , বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের জন্য পরিশ্রম করে, এখানে ওখানে টুকটাক কাজ করে, শেষ পয়সাটি পর্যন্ত জমিয়ে রেখে (আমরা শুনেছি তাঁর একটি মাত্র শার্টের কথা, যা তিনি রাত্তিরে কেচে শুকিয়ে রাখতেন), তিনি অপার আনন্দ খুঁজে পেতেন ক্লাসরুমের বক্তৃতায় আর লাইব্রেরির বইয়ে। তাঁর প্রাণচঞ্চল মন মুখিয়ে থাকত সহপাঠীদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে। কথা বলার ভঙ্গিটি ছিল যাকে বলে স্পষ্টাস্পষ্টি, কোথাও মজার কিছু থাকলে খপ করে ধরে ফেলতে সবসময় তৈরি। *Liberty and Subjection of Woman* [*নারীস্বাধীনতা ও নারীদমন*] প্রণেতা জে এস মিল, *Sociology* [*সমাজতত্ত্ব*] ও *Ethics* [*নীতিশাস্ত্র*] প্রণেতা হার্বার্ট স্পেন্‌সার, *Decline and Fall of the Roman Empire* [*রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন*] প্রণেতা গিবন, *Compromise* [*আপস*] প্রণেতা মর্লি এবং ফরাসী বিদ্রোহের অগ্রদূত রুসো, ভলটেয়ার, দিদেরো— সবাই এই যুবকের মনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছেন, তাঁকে চালিত করেছেন সত্তার গভীর থেকে আরও গভীরে।

তাঁর সমসাময়িক গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। স্বচ্ছল ও রক্ষণশীল বংশে তাঁর জন্ম হলেও তিলক আগারকরের খুব কাছে চলে এসেছিলেন। দুজনেরই ছিল মুহূর্তে গভীরে প্রবেশ করবার মতো মেধা, অস্থির উতরোল আদর্শবাদিতা আর ভারতের দাসত্ব সম্বন্ধে বেদনাময় সচেতনতা। ডেকান কলেজের কাছে সাদিলবাবা পাহাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলত তাঁদের আলোচনা, বিশ্লেষণ, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা— কেমন করে তাঁদের অজ্ঞতাপীড়িত, দারিদ্রগ্রস্ত, দাসত্বলাঞ্ছিত জাতির পুনরভ্যুদয়ের উদ্দেশ্যে এই নতুন শিক্ষাকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগান যায়।

তাঁর সমসাময়িক গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। স্বচ্ছল ও রক্ষণশীল বংশে তাঁর জন্ম হলেও তিলক আগারকরের খুব কাছে চলে এসেছিলেন। দুজনেরই ছিল মুহূর্তে গভীরে প্রবেশ করবার মতো মেধা, অস্থির উতরোল আদর্শবাদিতা আর ভারতের দাসত্ব সম্বন্ধে বেদনাময় সচেতনতা। ডেকান কলেজের কাছে সাদিলবাবা পাহাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলত তাঁদের আলোচনা, বিশ্লেষণ, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা— কেমন করে তাঁদের অজ্ঞতাপীড়িত, দারিদ্রগ্রস্ত, দাসত্বলাঞ্ছিত জাতির পুনরভ্যুদয়ের উদ্দেশ্যে এই নতুন শিক্ষাকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগান যায়। লক্ষ্য এক হলেও লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ ও পদ্ধতির বিষয়ে অবশ্য তাঁরা একমত হতে পারতেন না। দুজনেই জানতেন সরকারি চাকরির দাবি মেটানো তাঁদের কাজ নয়, যদিও এ মাধ্যমেই বিচারপতি [জাস্টিস] এম জি রাণাডে-র দেশসেবার

প্রচেষ্টার প্রতি ছিল তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা। দুজনেই দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত বিষ্ণুশাস্ত্রী বিপুলঙ্করের রণভেরীর আহ্বান শুনতে পেতেন *নিবন্ধমালা*-র কলামে। উপায়ের বা পদ্ধতির নির্বাচনে যুক্তিনির্ভর হতে হবে, আবেগতাড়িত নয়— এ ব্যাপারে দুজনেই ছিলেন একমত। আগারকরের অনড় অভিমত ছিল--- সমাজসংস্কার হচ্ছে রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বশর্ত। ওদিকে তিলক কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত হবার আগে সমাজসংস্কারের কোন রাস্তাই দেখতে পাননি। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা এই বিতর্ক থেকে বেরিয়ে এল দুজনেরই গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্ত— অভিমত যাই হোক প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষার। এ সিদ্ধান্তে আদর্শের ব্যাপারে কোন আপস নেই; এ হল পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত এক যথার্থ মধ্যপন্থা। সেই সময়ের গ্র্যাজুয়েটদের [স্নাতকদের] নাগালের মধ্যেই ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর আর্থিক স্বচ্ছলতা। কিন্তু সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দুজনেই বেছে নিলেন চরম বিরোধিতার রাস্তা। তাঁদের সঙ্কল্পেরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় মায়ের কাছে লেখা আগারকরের একটি চিঠিতে:

"'আমার ছেলে বড় বড় পরীক্ষা পাশ করছে, এবার সে একটা মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে আমার সব কষ্ট ঘোচাবে', তুমি নিশ্চয়ই তোমার ছেলেকে নিয়ে এমনই স্বপ্ন দেখছ মা। কিন্তু তোমাকে এখনই বলে রাখি— তা হবে না। টাকাপয়সা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমার জন্যে নয়। নামমাত্র রোজগার হলেই যথেষ্ট— আমি তাহলে আমার সারা সময়টাই এমন কাজে লাগাতে পারি যাতে অন্যের ভাল হয়।"

চিপলুঙ্কর, আগারকর ও তিলক তাঁদের স্বপ্নকে সত্যি হতে দেখলেন ১৮৭৯র পয়লা অক্টোবর, যেদিন প্রতিষ্ঠিত হল নিউ ইংলিশ স্কুল, পুনা। সেই সন্ধিক্ষণেই আগারকর ডেকান কলেজের সিনিয়র ফেলো মনোনীত হলেন। সেজন্য চুক্তি অনুযায়ী তিনি এক বছর দেরি করে এম এ পাশ করার পর কাজে যোগ দেন। বিশিষ্ট ও উৎসাহী শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে দেখতে দেখতে স্কুলটির খুব বাড়বাড়ন্ত হল। এই তিন উচ্চাশীর পক্ষে সত্যিই এই কাজের গন্ডীর মধ্যে আটকে থাকা সম্ভব হল না। তরুণ প্রজন্মের পরিধির বাইরে ব্যাপ্ত জনসাধারণের মধ্যে এই মশাল নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। এই তীব্র ইচ্ছে আর তা মেটাবার মতো আত্মবিশ্বাস থেকেই জন্ম নিল দুটি নতুন সাময়িকপত্র, মারাঠী ভাষায় *কেশরী* ও ইংরেজি ভাষায় *Maratha* [*মারাঠা*]। *কেশরী*র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল চৌঠা জানুয়ারি, ১৮৮১, সম্পাদক ছিলেন আগারকর। আকর্ষণীয় রচনাশৈলী, তথ্যসমৃদ্ধ রচনা আর উত্তপ্ত সমালোচনা— অন্যায় অবিচারের নিন্দায় সোচ্চার হলে ত কথাই নেই— এই সব গুণেই *কেশরী* খুব তাড়াতাড়ি সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কোলাপুর কাণ্ড নিয়ে *কেশরী*র প্রবন্ধগুলি প্রতিপক্ষকে বেকায়দায় ফেলে দিল। তদানীন্তন মহারাজার মন্ত্রী, শ্রীযুক্ত কার্ভে মহাশয় আগারকর ও তিলকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। বিচারে তাঁদের তিন মাসের কারাদণ্ড হল। আগারকর প্রণীত *The 101 days in the Dongri Prison* [*ডোংরি কারাগারে ১০১ দিন*] আধুনিক ভারতে কারাগার-সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্যে সম্ভবত প্রথম বই। সেই ডেকান কলেজের বিতর্ক যেন বিরতির পর আবার শুরু হল। তবে এই বিতর্ক এখন অভিজ্ঞতা ও পরিণতমনস্কতার বলে বলীয়ান। কারার রাত্রির ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতার মধ্যেও তাঁরা চালিয়ে যেতেন বিতর্ক, মাঝে মাঝে ছেদ পড়ত প্রহরীর হুঁশিয়ারি হুঙ্কারে।

কারাবাসের মেয়াদের মধ্যেই চিপলুঙ্করের অকালমৃত্যুও তাঁদের দমাতে পারেনি। অবিচল প্রাণশক্তি নিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করলেন আবার। দা ডেকান এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর স্কুলকে রাখা হল এর তত্ত্বাবধানে। সোসাইটিরই তদারকিতে রইল নিউ ফার্গুসন কলেজ যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫র দোসরা জানুয়ারি। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ অভিধানরচয়িতা ভি এম আপ্তের মৃত্যুর পর অধ্যক্ষ হন আগারকর। আগারকর পড়াতেন ইতিহাস ও তর্কশাস্ত্র। বিষয়বস্তুর সুবিন্যস্ত উপস্থাপনা মাঝে মাঝে সমালোচনা মেশানো স্বগতোক্তিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

সাংবাদিকতার প্রথমদিকের বছর কয়েক তিলক ও আগারকর-এর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যগুলি তেমন করে বেরিয়ে আসেনি; বেরিয়ে এল Age of Consent Bill of 1894 [বিবাহে সম্মতির বয়স সংক্রান্ত বিল, ১৮৯৪]-এর পর। আগারকর বিলটি সোৎসাহে সমর্থন করলেন এবং স্বেচ্ছায় সপক্ষে প্রচারের দায়িত্ব নিলেন। বিলটির দৃঢ় বিরোধিতা করলেন তিলক, তাঁর মতে এটি আমাদের সবচেয়ে ভিতরকার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিদেশি শাসকের হস্তক্ষেপের সামিল। তাঁদের মেজাজের আর তাত্ত্বিক অবস্থানের গরমিলটা ছিল এতই বেশি যে কেউ তাঁর নিজস্ব জায়গা ছাড়তে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত তিলক সোসাইটি ও কলেজ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং আগারকরের থেকে *কেশরী*-র দায়িত্ব অধিগ্রহণ করলেন। প্রতিষ্ঠিত হল আগারকরের নিজের কাগজ *সুধারক* (*The Reformer*)। এই দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্রিকাটির ইংরেজি বিভাগের কাজ পরিচালনা করতেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। "যা বলা উচিত তা বলা হবে আর যা করা যায় তা করা হবে"— এই ছিল আদর্শ মন্ত্র [motto] আগারকরের জীবনের গভীরতম আকুতি প্রকাশের মাধ্যমের, পুরোনো মতবাদ লোকাচার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার হাতিয়ারের। সমাজের রক্ষণশীল অংশ তিক্ততার

শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁকে উত্ত্যক্ত করে গেছেন। শত্রুর মতই যুদ্ধ চালিয়েছেন তাঁর এক সময়ের কাজের সঙ্গী তিলক। তাঁরা একে অন্যের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। দুঃখই হয় যখন দেখা যায় যে বাদানুবাদের উত্তাপের মধ্যে তাঁরা দুজনেই এক এক সময় বৈধ তর্কযুদ্ধের সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছেন।

তাঁর জীবনের শেষ সাত বছর ছিল অবসাদের আর যন্ত্রণার সময়। কাঁধে তখন কলেজের আর *সুধারক* সাময়িকপত্রের দ্বৈত দায়িত্ব; অল্পবয়সেই চলে যেতে দেখলেন অধ্যাপক আপ্তে-র আর অধ্যাপক ভি ভি কেলকার-এর মতো কর্মঠ তেজস্বী মানুষকে; নিজেকেই দেখলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু তিলকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে; হাসিমুখেই সম্মুখীন হলেন দারিদ্রের (ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁকে দেওয়া হত মাসে ৭৫ টাকা) আর গণকুৎসার। নিজের চোখে নিজের শবানুগমনের শোভাযাত্রা দেখার 'সম্মান' জুটেছিল তাঁর; (এই শবযাত্রার আয়োজন করেছিলেন পুনার জনসাধারণের রক্ষণশীল অংশ)। বাঁচোয়া বলতে ছিল তাঁর কৌতুকবোধ আর সুখী বিবাহিত জীবন। স্ত্রী যশোদা আর তিনটি শিশুসন্তানের ভরণপোষণের সংস্থান তিনি করতে পারছেন না— এই উপলব্ধি তাঁর মনকে কুরে কুরে খেত। কিন্তু যে পথ তিনি বেছে নিয়েছেন তা থেকে কখনও পিছিয়ে আসেননি; চিন্তা, কথা আর কাজ সব সময়ই এক ছিল তাঁর নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিগত জীবনে। সারা জীবন ধরে হাঁপানি রোগে কষ্ট পেয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই সামনে কী আসছে আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই কর্মযোগী পার্থিব তাপসকে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হল। যা রেখে গিয়েছেন, তা হল আলাদা করে রাখা সামান্য কিছু টাকা 'আমার শেষকাজের খরচের জন্য'— তাঁর নিজের হাতে লেখা। বলতে গেলে এইটুকুই সব বলা যেত, যদি কেউ ১৪ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁর বিভিন্ন রচনার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করতে পারত।

তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম সাত বছরের যে সব রচনা *কেশরী*তে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে লেখকের নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে লেখাগুলি তাঁর বলে নির্দিষ্ট করা যায়। *সুধারক*-এর প্রবন্ধগুলি তাঁর মৃত্যুর পর সংগৃহীত হয়েছে। তারপর আছে *বিবিধ বিষয় সংগ্রহ* (বর্ণনামূলক ও চিন্তাপ্রধান নানা বিষয়ের প্রবন্ধের সঙ্কলন), ডোংরি কারাগারের স্মৃতিকথা, *বাক্যমীমাংসা* যেখানে মারাঠি বাক্য গঠনের নিয়মের বর্ণনার এক নতুন দিশা লক্ষ্য করা যায় এবং *বিকারবিলসিত*, *হ্যামলেট*-এর এক সার্থক ভাষান্তর। তাঁর রচনার মজ্জা বলা যায় অবশ্যই তাঁর প্রবন্ধকে যার মধ্য দিয়ে আমরা পাই সমসাময়িক পরিস্থিতির আভাস, ভারতীয় নবজাগরণের প্রণোদনার বিভিন্ন দিক এবং প্রবন্ধপ্রণেতার বহুদূরবিস্তৃত মনের নানা বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি। 'সাংবাদিকতার গুণে ভরপুর' বলতে সবচেয়ে ভাল যা বোঝায়, তেমনই এই প্রবন্ধগুলি মিলিয়েছে তাৎক্ষণিক বাস্তব বিশেষ ভাবনার সঙ্গে চূড়ান্ত বিমূর্ত বিশ্বব্যাপী ভাবনাকে। তাঁর রচনাকালের পরিসর এতই ছোট যে তাঁর চিন্তার ক্রমিক বিকাশ লক্ষ্য করা সম্ভব নয়— বরং তাঁর সবচেয়ে পরিণত ও প্রগতিশীল ভাবনার কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর সবচেয়ে আগেকার রচনায়। একটি সামাজিক আচরণবিধি এবং আমাদের সামাজিক জীবনের নানা সমস্যার সমাধানে এবং অন্যায়ের অশুভের প্রতিকারে প্রতিরোধে সেই বিধির সার্বিক প্রয়োগ— এই বিষয়টি ঘিরে ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর রচনায়। তাই বলে তিনি কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাধিগুলির কথা ভুলে যান নি। আগারকর ছিলেন এক বিপ্লবী। তাঁর সমসাময়িকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন তিনি। অন্যায় অবিচারকে দূর করতে চেয়েছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে; সমসাময়িকদের কাছে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার আবেদন করেছেন। তাঁর কাছে ব্যক্তিসত্তা পবিত্র। জাতিধর্ম লিঙ্গ যাই হোক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তির তার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার বিকাশের এবং তার সবচেয়ে ভাল পরিণতি অর্জনের সুযোগ থাকা চাই— এই ছিল তাঁর দৃঢ় অভিমত।

বর্তমান তাঁকে দিয়েছে যন্ত্রণা আর অতৃপ্তি। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন আশাবাদী। প্রত্যয় সঞ্চারে যুক্তির ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাছে এটা ছিল মানুষকে ভাবতে আর কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে প্রণোদিত করার প্রশ্ন। তাঁর কলম অ্যাসিডে চোবানো হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পিত্তে চোবানো হয়নি কখনও। তাঁর চেয়ে বয়সে বড় গোপাল হরি দেশমুখ (লোকহিতবাদী)-এর সঙ্গে তাঁর এখানেই গরমিল। দেশমুখের দোষ হল, তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রায়ই শ্রোতাদের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে ফেলতেন। আগারকরের লেখায়ও মাঝেমধ্যে শ্লেষ দেখা গেছে, তবে তাতে তাচ্ছিল্য ছিল না; কৌতুকরসের মিশেলে তীব্রতা তেমন থাকত না। যুক্তি দিয়ে বোঝালে মানুষ বুঝবে এমন বিশ্বাস তিনি কোথা থেকে পেলেন? তিনি যখন সমালোচনা করতেন, তখন কি একইসঙ্গে তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করতেন? না কি তিনি ভেতরে ভেতরে বড়ই ভাল মনের মানুষ ছিলেন? আমার নিবেদন— এই সব নয়, আরও আছে। আগারকরের যুক্তিবাদ ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে চড়াও হয়ে মনের দখল নিতে যায়নি কখনও, ছোট মনের পরিচয়ও দেয়নি কখনও। যুক্তির সীমার বিষয়ে বেশ সূক্ষ্মভাবেই সচেতন ছিলেন তিনি— তিনি ছিলেন যুক্তিসংগতভাবে

যুক্তিবাদী। তিনি ভাবতেন মানুষের জীবনের আছে নানা দিক [facet] আর মানুষের কর্মের (action) মধ্যে লুকিয়ে আছে নানা তাড়না [drive]। যুক্তির কাজ [funstion] হল মানুষের কর্ম আর চিন্তার ন্যায্যতার, যথাযথতার [rightness] বিচার করা। এর মধ্য দিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে এ কথা বোঝানো হয়নি যে যুক্তি সদা-অভ্রান্ত ও সর্বজ্ঞানের আধার। যুক্তি ছাড়া সত্যের কাছে যাবার আর কোন সরাসরি রাস্তা নেই। যথাযথতার মাত্রা যাই হোক, জ্ঞান হল মূল্যস্বরূপ [value]; কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান যুক্তির সহায়তায় জ্ঞান অর্জনের প্রয়াস। এই ব্যাপারটি কোন ব্যক্তি বা সমাজ যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারে, তার পক্ষে ততই ভাল। জ্ঞানের সহায়তায় প্রকৃতিকে জয় করাই জীবন নয়, জীবন হল জ্ঞানের সীমা পেরিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে এক অনন্ত অন্বেষণ। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি কখনও ছাড়েননি; তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুক্তিনির্ভর তর্কযোদ্ধা, কিন্তু কখনই আত্মতৃপ্ত অন্ধবিশ্বাসনির্ভর মতাভিমানী [dogmatic] ছিলেন না।

এই সুবিধাজনক অবস্থানটিকে নিজের বলে গ্রহণ করে আগারকর এগিয়ে গেলেন শুধু এর তাত্ত্বিক ভিত্তিটিকে তৈরি করতেই নয়, তাঁর স্বদেশবাসীকে শেখাতে কী করে জীবনের, বিশেষ করে তখন সেখানে যে জীবন যাপন করা হচ্ছিল, সেই জীবনের সমস্যাকে নতুন চোখে দেখতে হয়।

'আমাদের বিশ্বলোকই এ পর্যন্ত একমাত্র বিশ্বলোক হতে পারে, নাও হতে পারে। যা কখনও জানার উপায় নেই,, তাই নিয়ে তর্ক করা নিরর্থক বললেই চলে। আমাদের ভাবনা হল বর্তমান বিশ্বলোককে নিয়ে, যার মধ্যে আমাদের বিশেষ গোলকটির অবস্থান; আমাদের ভাবনা আমাদের প্রজাতিকে [species] নিয়ে সব প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে যার অবস্থান; আর এটাই তো ঠিক।'

তিনি নিজের সীমা ঠিক করে নিয়েছিলেন বিচারবিবেচনা করেই। আরও এগিয়ে থাকা সমাজে তিনি নিঃসন্দেহে দর্শন শাস্ত্রের চূড়ান্ত সমস্যাগুলিকে শক্ত মুঠোয় ধরে সমাধানে ব্যস্ত থাকতেন, তার চেয়ে বরং তিনি সাধারণ মানুষকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবেন, তার কল্যাণের সন্ধানে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করবেন। স্বার্থত্যাগের এই নিদর্শন উপরে উদ্ধৃত চিঠিতে প্রকাশিত ভাবের সঙ্গে মিলে যায়। দুইয়েরই পিছনে আছে বাস্তবিকতা সম্বন্ধে তাঁর গভীর উপলব্ধি।

তিনি মেনে নিয়েছিলেন মানুষের মনের সীমাবদ্ধতা। কেউ কেউ পোষণ করেন এমন এক অলীক আশা যে চারদিকের পরিবেশের এক শুভকর পরিবর্তন ভিতরের সব বাধাকে গলিয়ে দেবে; অন্যেরা আবার জনসাধারণের কাছে বড় বেশি প্রত্যাশা করে বসেন— হৃদয়ের পরিবর্তন; আর বড় বেশি প্রত্যাশা করেন বাস্তব পরিস্থিতি থেকেও— মানুষের সদাশয়তার সহায়ক নমনীয়তা। আগারকর প্রবেশ করেছিলেন আরও গভীরে, চিনে নিয়েছিলেন যুক্তির আর আবেগের, পরিবেশের আর মানুষের ইচ্ছাশক্তির, শুভের আর অশুভের, সঙ্গতির আর অসঙ্গতির প্রকৃত স্বরূপ।

কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসের বাইরে তাঁর রচনায় হিন্দুধর্মের মুখ্য সমালোচনা ছিল পরলোক নিয়ে পড়ে থাকার বাড়াবাড়িকে কেন্দ্র করে। এই জগতের দিকে পিছন ফিরে থাকা আর অন্য জগৎ (যদি তেমন কিছু থাকে) সম্বন্ধে আগে থেকেই ঠিক বলে ধরে নেওয়া কোন একটা ধারণায় বিশ্বাস করে নিজের ইহজীবনের জন্য লজ্জা পাওয়া— এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে ছিল মূর্খতা, আত্মহনন আর বিকারগ্রস্ত বিষণ্ণতার [morbidity] সামিল। সুস্থ জীবন যাপন প্রত্যেকের প্রাথমিক কর্তব্য। ইন্দ্রিয় আর বিচারবুদ্ধি দিয়ে গড়া এই জীবনে মানুষের কাজ সৌন্দর্য উপভোগ করা, সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। তিনি দুঃখ করতেন এই বলে যে হিন্দুরা ইহলোকাতীতের খোঁজে থেকে প্রকৃতির দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। তিনি চাইতেন তাদের চোখ খুলে দিতে— তারা দেখুক এই জীবনের বিচিত্র আনন্দকে— প্রেমনিবেদন, বেশভূষা, খেলাধুলা, উৎসব, কাব্য উপভোগ - মানবিক কোন কিছুই দূরের ভাবতেন না তিনি। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই ভালবাসতেন— যেমন সে আছে তার স্বাধীন নিজস্ব সত্তায়। যখন দেখতেন এই জীবনকে ধরে নেওয়া হচ্ছে অপার্থিবকে অর্জন করার উপায় হিসেবে, তখন খুবই কষ্ট হত তাঁর। তাই বলে তিনি শ্রেয়োবাদী [hedonist, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরামই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, এই মতবাদে বিশ্বাসী - অনুবাদক] ছিলেন না। মনের আনন্দকে ইন্দ্রিয়ের আনন্দের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন তিনি। নিজের এবং প্রতিবেশী মানুষজনের জীবনের স্থায়ী সমৃদ্ধি সাধনের কাছে তাৎক্ষণিক সুখভোগকে তো হার মানতেই হবে। তিনি যেন *অর্থ* ও *কাম* কে *ধর্ম* ও *মোক্ষ* র সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বল্‌গাহীন, স্বার্থপর সুখের পিছনে ঘোরার বিপদ তিনি জানতেন। তিনি সম্পদের সুষম বন্টনের উপর তেমনই জোর দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন সম্পদের বৃদ্ধির উপর। সসম্মান স্বীকৃতি দিয়েছেন আত্মত্যাগের আনন্দকে। আবার তিনি এমন ইঙ্গিতও করেছেন যে মানুষের স্বার্থপরতার প্রতিকার ত্যাগে নয়, বরং ইহজগতের আশা-আকাংক্ষার চরিতার্থতায়।

"শ্রম করবে যে, শ্রমের ফল সেই উপভোগ করবে, আর কেউ নয়— এমন ইচ্ছে কিন্তু মানুষের প্রাণসত্তার ভাল থেকে আরও ভাল হয়ে ওঠার শেষ পর্যায় নয়। এই ফল শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে তার পছন্দমত ব্যবস্থা করা মানবসত্তার নানা চাওয়ার মধ্যে একটি। এই চাওয়া যতই পাওয়া যায় স্বার্থপরতা ততই দুর্বল হয় আর পরহিতবাদের কাছে মাথা নীচু করে।"

ব্যক্তির সুখ ও সমাজের কল্যাণের ভাবনা নিয়ে গড়ে ওঠা

আগারকরের 'ধর্মবিশ্বাস'কে বলা যায় 'ইহজীবনকেন্দ্রিক আর মানবিকতাকেন্দ্রিক'-এই শব্দবন্ধের শ্রেষ্ঠ অর্থে।

সামাজিক চিন্তকদের একটি বড় গোষ্ঠী সামাজিক স্থিতিশীলতার (stability) উপর গুরুত্ব দেন। ধরেই নেওয়া হয় একক ব্যক্তি [individual] সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন, বিপ্লব বা এই ধরনের যে কোন ব্যাপারকেই সন্দেহ করা হয় স্থিতিশীলতাবিরোধী বা স্থিতিশীলতাবিধ্বংসী বলে। ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থনের অর্থ করা হয় স্বার্থবোধের হয়ে ওকালতি। আগারকর ছিলেন সেই বিরল সংখ্যালঘুদের একজন যারা সামাজিক পরিবর্তনকে মান্যতা দেন মানবসমাজ সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধির মূলসূত্র হিসেবে। মানুষ সামাজিক বন্ধন আর বিধি নিয়ম সৃষ্টি করে পরিশ্রম বাঁচাতে আর আত্মোপলব্ধি সুনিশ্চিত করতে। প্রথমোক্তটি হল শেষোক্তটিকে পাবার উপায়। সামাজিক বন্ধন আর বিধিনিয়ম যদি তাদের কাজ ঠিকমতো না করতে পার আর ব্যক্তির পক্ষে শিকলের সামিল হয়, তখন সে শিকল ভাঙতে হয় স্থিতিশীলতা নষ্ট করেই। কারণ স্থিতিশীলতাও হবে মৃত্যুর সামিল, যদি না তার ভিত্তিগুলি সারাক্ষণ বারবার পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং উন্নতিসাধনের রূপরেখা ঠিক করে ফেলা হয়। মৃতকে বর্জন করবার সাহস এবং সেজন্যই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে সব পদার্থ মানুষকে মৃতের মতো নিস্তেজ অনুভূতিহীন করে দেয় সে সব বর্জন করবার সাহস এবং সামাজিক বিপ্লবকে গ্রহণ করবার সাহস যে কোন সামাজিক চিন্তকের এক প্রয়োজনীয় গুণ। যারা একটানা সমাজকল্যাণের বাজনা বাজাতে থাকেন এবং এই সাহসকে প্রকাশ্যে রীতিমত শপথ নিয়ে পরিত্যাগ করেন, চূড়ান্ত বিচারে তাঁরা তাঁদের ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া মনের শান্তির স্বার্থে সমাজকল্যাণকেই বিসর্জন দেবার দোষে দোষী। সমাজকল্যাণের পূর্বশর্ত হল একটি জীবন্ত পরিবর্তনশীল সমাজ। ধর্মের উৎপত্তি এবং *বর্ণ* ও *জাতি*র ব্যবস্থার বিচারবিশ্লেষণে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের আপেক্ষিকতার ব্যাপারটি কখনই আগাকরের চোখ এড়িয়ে যায়নি।

'এই বিশ্বের পরিবর্তনের বিরাম নেই, দয়ামায়া নেই— এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর চিন্তাশীল মানুষ মন দেন সাধ্যমত নিজের আচরণেও একটা বদল আনতে, যাতে তা বাঞ্ছনীয় পরিবর্তনের সহায়ক হয়।'

হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচনায় তিনি নির্দয়, তাঁর মতে এগুলিই ব্যক্তির, বিশেষ করে নারীর আত্মোপলব্ধির পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। এ বিষয়ে নিজেকে ঠকানো, সামাজিক জীবনে মেরুদণ্ডহীনের মতো চুপচাপ সব কিছু মেনে নেওয়া, *পুরুষার্থ* হীন জীবন - এ সবের প্রতি তাঁর মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এ সব ক্ষেত্রে তাঁর কলমে থাকত সবচেয়ে ভাল রকমের অ্যাসিডের ঝাঁঝ। এই ওষুধে গোঁড়া সনাতনপন্থীদের তীব্র প্রতিক্রিয়াতেই প্রমাণিত হত— এ ওষুধ ঠিক জায়গাতেই পড়েছে।

এ ধরনের সমালোচনা আগারকরই যে প্রথম করেছেন, তা নয়; বিচারপতি রাণাডে এ কাজ করেছেন তাঁর আগেই। কিন্তু হিন্দু সমাজ তাঁদের যত বিষ জমিয়ে রেখেছিল কেবল আগারকরের জন্য; আগারকরের কথা বেশি কড়া— শুধু এই কারণেই নয়। রাণাডে তাঁর সংস্কারের পক্ষে যুক্তি জোরদার করবার জন্য খেয়াল করে খাঁটি ভারতীয় রীতিতে শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতির প্রয়োগ করেছেন। মারাঠার ইতিহাসে ভক্তি আন্দোলনের সন্ত কবিদের ভূমিকার আলোচনায় তিনি তাঁদের ধর্মীয় মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ধরনের কথায় ঠিক সেই সমাজের লোকদের মনের সূক্ষ্ম জায়গায় একটু তেল দেওয়া হল, যে সমাজ একসময় এই সব দূরদর্শী সৎ মানুষদের সবাইকে সমান জ্ঞান করার শিক্ষা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। রাণাডের লেখা ছিল সুস্বাদু, যদিও অবশ্য তিলকের মত বেশি ধারালো সমালোচকেরা তাঁর যুক্তির শাস্ত্রীয় খুঁটিগুলো যে কত ফাঁপা তা সবার সামনে প্রকট করে দিতে দেরি করেননি। আগারকর কিন্তু এ ধরনের রণকৌশলকে একেবারেই পাত্তা দিতেন না। একবার যদি কোন নীতি, ধরা যাক, নারীর সমানাধিকার যুক্তির বিচারে গ্রহণীয় হয়, তখন শাস্ত্রীয় ক্রাচ [ভর দেবার লাঠি] পাওয়া গেল কি না গেল, তার কাছে একই কথা। সে যাই হোক, যে কোন প্রস্তাবের পক্ষে বা তার বিরোধী প্রস্তাবের পক্ষে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জ্ঞান বা অতীত নজির খুঁজে পাওয়া শক্ত নয় আর 'তিনি বলেছেন, সেখানে আছে'র উপর নির্ভর করা তর্ক নিষ্ফল হতে বাধ্য।

"সায়ন, পাণিনি, মম্মত [Mammata], দণ্ডী, চরক, সুশ্রুত, ভাস্কর ও অন্যান্য মনীষীরা অবশ্যই মহান্। সকালবেলা উঠে তাঁদের নাম নিলে বা তাঁদের রচনার প্রতি শ্রদ্ধা জানালে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তাঁদের জন্য অখণ্ড মহিমাকীর্তনগানের আর তাঁদের রচনা বুকে আঁকড়ে থাকারও কোন মানে হয় না। তাঁদের রচনার মধ্যে যা কিছু সংরক্ষণের উপযুক্ত তা নিশ্চয়ই সংরক্ষণ করা উচিত। কিন্তু তাঁদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সরিয়ে ফেলার কাজে আর এই ঐতিহ্যে নতুন অবদান রাখার কাজে ফাঁকি দিলে তো চলবে না।"

এতে অবাক হবার কিছু নেই যে সমাজের যে শ্রেণীর মানুষেরা এই সমস্ত প্রাচীন বিশারদদের নিয়ে খুব হৈ চৈ করেছিলেন এবং এ সব রচনায় তাঁদের বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য সমাজে উচ্চতর মর্যাদার দাবিদার হয়েছিলেন, আগারকরের কথায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আঁতে ঘা লেগে গেল এবং তাঁরা আগারকরকে একঘরে করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

একটি বিষয় বিশেষ করে দেখানো দরকার। আগারকর কিন্তু যা কিছু প্রাচীন ও ভারতীয় তার পূজার সেই আগেকার অভ্যাসের জায়গায় বিকল্প হিসেবে যা কিছু আধুনিক ও পাশ্চাত্য তার অন্ধ আরাধনাকে বসিয়ে দেবার মতো ভুল করেননি। তিনি চেয়েছিলেন বিশারদদের জ্ঞানকেই নির্ণায়ক হিসেবে ধরার বদলে যুক্তিনিষ্ঠ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের [rationalist empiricisim] মূল্যের প্রতিষ্ঠা। এর ফলেই তিনি তথাকথিত সংস্কারপন্থীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন, যাদের দোষ হল ব্রিটিশদের অন্ধ অনুকরণ, সঙ্গী ভারতীয়দের প্রতি অর্থহীন ঘৃণা, নগ্ন ভোগবাদের পক্ষে মনকে বোঝানোর মতো যুক্তি খাড়া করা আর বিদেশী শাসকের অনুগ্রহ মনের আনন্দে উপভোগ করা।

আগারকর মনে করতেন রাজনৈতিক আন্দোলনের থাকা চাই কিছু অপরিহার্য সামাজিক সংস্কারের এক দৃঢ় বনিয়াদ। বিদেশী আধিপত্যে ভারতীয় সমাজের নিরন্তর ক্ষয়ের এক হৃদয়বিদারক ছবি এঁকেছেন তিনি। ভারতীয় অর্থনীতিকে নিঃস্ব করে দিয়ে শোষণ সম্বন্ধেও তিনি গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারের অনড় দাবিতে তিনি তিলকের থেকে কোনভাবেই পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক রচনা পরিমাণে কম, এই ওজরে তাঁর প্রগতিশীল অবস্থানকে ভুল বোঝা ঠিক নয়। তিনি যদি আরও বেশি সময় বাঁচতেন, তাহলে তিনি বন্ধু গোখলের নেতৃত্বে নরমপন্থী [moderate]দের সঙ্গে যোগ দিতেন, এমন অনুমান করাও ভুল। নরমপন্থী সাংবিধানিক পথ পছন্দ করে— এটাই সব নয়। নরমপন্থার শিকড়ে রয়েছে জনসাধারণের প্রতি মৌলিক অবিশ্বাস আর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের [direct action] বিরোধিতা। আগারকর এ দুটি থেকেই মুক্ত ছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হলে সরকারের সমালোচনায় এবং প্রগতিশীল কার্যক্রমের সমর্থনে তিনি তেমনই নির্ভীক থাকতেন, যেমন ছিলেন সামাজিক 'এই বেশ ভাল আছি' মনোভাবের বিরুদ্ধে আক্রমণে। আধুনিক মহারাষ্ট্রের অগ্রগণ্য মনীষী আচার্য জাওদেকর [Javdekar] তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে সঠিকভাবেই অভিহিত করেছেন প্রগতিশীল উদারতাবাদ [radical liberalism] নামে।

জাতীয়তাবাদী আদর্শে আগারকরের সমর্থন কখনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি। সেই সমর্থনেও ছিল তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ। সামাজিক সংস্কারের বেলায় যেমন করে তিনি শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অগ্রাহ্য করেছেন, ঠিক তেমনই তৎপরতায় তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী ভাবকে দাঁড় করাবার জন্য পুনরুজ্জীবনের ভাবনার খুঁটি-ঠেকনোগুলিকে। তিলকের মত স্বরাজের জন্মগত অধিকারকে আমাদের রাজনীতির অতীত গৌরবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, জাতীয় আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলবার জন্য মারাঠার ইতিহাসকে ব্যবহার করা, স্বাধীনতা অর্জনকে অতীত গৌরবের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে এক করে দেওয়াকে তিনি দরকার মনে করেননি। আমাদের অতীতের যে সব ব্যাপার তেমন গৌরবময় নয়, সে সব স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে নিতেন আগারকর, মেকি পালিশ দিয়ে খুঁত আড়াল করতে রাজি ছিলেন না তিনি। স্বাধীনতার অধিকারের জন্য আলো-ঝলমল ঐতিহাসিক পরম্পরা একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। বাস, সোজা কথা।

স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থার কেমন ছবি ফুটে উঠত তাঁর মনের চোখে? এক্ষেত্রে ভারতীয় গণতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রবক্তাদের একজন হবার সম্মানের অধিকারী তিনি। উনিশ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিল প্রবর্তিত ব্রিটিশ উদারতাবাদ [liberalism] তিনি গ্রহণ করেছিলেন। গণতন্ত্র তাঁর কাছে শুধু সর্বজনের ভোটাধিকার নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। এ হল এক জীবনচর্যা, যার ভিত্তি ব্যক্তিসত্তার [individual] পবিত্রতা। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তিনি কোনরকম ইতস্তত না করে সর্বাধিকারবাদী একদলীয় [totalitarian] শাসনে সম্ভাব্য সমৃদ্ধিকে ছেড়ে বেছে নিতেন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে। বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁর মত নিবেদিতপ্রাণ গণতন্ত্রবাদীর দৃষ্টিতে বিভিন্ন ব্যাপারেই হিন্দু সমাজের দোষ ধরা পড়ত।

মারাঠি সাংবাদিকতার ইতিহাসে আগারকর এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। মারাঠি ভাষায় মননসমৃদ্ধ [serious] প্রবন্ধের উন্নতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। চিন্তার বা ধারণার যুক্তিনিষ্ঠ ও স্পষ্ট উপস্থাপনা, সহজ সরল রচনাশৈলী, বেঁচে থাকার বেশ কিছু মৌলিক সমস্যা থেকে বিষয়বস্তুর চয়ন— এ সবই মুখ্যত সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য। সাংবাদিকতা তাঁর কাছে ছিল সামাজিক শিক্ষার উপকরণ। এই লক্ষ্যের কথা ভেবেই তিনি সম্পাদকীয় রচনার ব্যাপারে খুবই উচ্চমানের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। সাধারণ মানুষের আলস্যকে বা নানা বদ্ধমূল পছন্দ-অপছন্দকে প্রশ্রয় দেবার পথে যাননি তিনি, কিন্তু তাই বলে তিনি কোন-কিছুতেই-ভাল-না দেখা মানুষ [cynic, বাংলা প্রতিশব্দ শুভনাস্তিক] ছিলেন না। যে কোন অবিচার প্রথমে তাঁর হৃদয়কে এবং ক্রমে তাঁর প্রজ্ঞাকে আলোড়িত করত। তাঁর লেখা দিয়ে তিনি পাঠককে প্রণোদিত করেন ভাবতে, আদ্যোপান্ত চিন্তা করতে, এইভাবেই তিনি পাঠককে অন্যায় অবিচার অনুভব করিয়ে ছাড়েন। চিপলুঙ্করের শৈলীর মার্জিত আড়ম্বর নেই তাঁর রচনাশৈলীতে, নেই তিলকের লেখনীর সুগম্ভীর পরিচ্ছন্নতা। নানা রঙে রঙীন, চেহারায় সৌষ্ঠব নেই, একটু বেঢপই বলা যায়। এখানে দেখছি তারের মত সরু, শক্ত অথচ নমনীয়, ওখানে দেখছি ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত রূপ; এখানে বিদ্রূপ এতই জবরদস্ত যেন

হাতুড়ির ফলা দিয়ে পেটাচ্ছে তো পেটাচ্ছেই; কোথাও বা চকিতে সরু তলোয়ারের মতো শ্লেষের সূক্ষ্ম খোঁচা (তবে হ্যাঁ, অন্যায়ভাবে কোমরবন্ধের নীচে কখনই নয়); কোন বোকার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো কাজ খোলাখুলি দেখিয়ে দেবার সময় রগুড়ে মজাদার আবার তারই নিন্দায় ক্রোধে অধৈর্য। তিনি ভবভূতিকে কালিদাসের চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। ভবভূতি কম ধ্রুপদী [classical], কিন্তু কোন জিনিসের ছেঁড়া ফাটা দুর্বল জায়গাগুলি তাঁর অনুভবে বেশি করে ধরা পড়ত; কল্পনার পাখায় উড়ে বেড়াবার ক্ষমতাও বেশি ছিল তাঁর। কিছু কিছু করে এই দুই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যই ছিল আগারকরের।

আগারকরকে ঠিক পটভূমিতে দেখতে গেলে এটা বুঝে নেওয়া জরুরী, পরম্পরা তাঁর সমকালীনদের কিরকম বজ্রমুষ্টিতে এঁটে ধরেছিল। তাঁর মত নাস্তিক এবং জাতপাতজর্জরিত হিন্দু সমাজের কঠোর সমালোচকের অস্তিত্ব সত্যিই তাঁদের কাঁটার মতোই বিঁধত। যারা আগারকরের শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাঁদের জন্য যে কী ভয়ঙ্কর পরিণাম অপেক্ষা করছে সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন সনাতনপন্থীরা। দুঃখের কথা, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এঁদের হাত শক্ত করেছে তিলকের অতিসাবধানী বৈধতাবাদ [legalism] আর তথাকথিত সংস্কারবাদীদের স্রোতে গা ভাসানো ভোগবাদ [hedonism]। নৈতিকতার নিরিখে আগারকরের অবস্থান যে আরও উঁচুতে, তা তিনি নিজেই দেখিয়েছেন তাঁর কথায় ও কাজে, সে সময়ের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে অনৈতিকতার উদ্‌ঘাটনে, তাঁর নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা এবং নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিগত চরিত্রের উদাহরণে— যা সে সময়ের কয়েকজন গুণীমানী সনাতনপন্থী ও সংস্কারবাদী মানুষের জীবনের মিথ্যাচারকে আরও প্রকট করে তুলেছে। সমাজে একজন সত্যিকারের সমাজসংস্কারকের সম্মানজনক স্থান আগারকরই অর্জন করে এনে দিয়েছেন তাঁর ক্ষেত্রে একটি উঁচু মান বা আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে; সে আদর্শ ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে তিলকের নির্ধারিত আদর্শের মতই উঁচু। অন্য মানুষদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে নিজেদের তাঁদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আর সংস্কারবাদী আন্দোলনকে একটি বুদ্ধির খেলায় পর্যবসিত করে সংস্কারবাদীরা যে কী বিপদ ডেকে আনছিলেন, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুণেই আগারকর তা দেখতে পেয়েছিলেন।

সমাজকে ঠিক ঠিক কেমন বা কতটা প্রভাবিত করেছে তাঁর রচনা, সেই বিচারবিশ্লেষণ সহজ নয়। এ কথা ঠিক, আগেই ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিবা ফুলের নেতৃত্বে *সত্যশোধক সমাজ*-এর রূপ নিয়েই একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে পরের প্রজন্ম প্রজন্মান্তরের সামনে তুলে ধরার কাজটি পড়ে ছিল আগারকরের জন্যই।

"শেষ কথা হল এই, হিংসাশ্রয়িতা, বলপ্রয়োগ, বাধ্যকরণ এবং অনুরূপ অন্য সব কিছু মানুষের পরম সুখের সহায়ক কর্মপদ্ধতি নয়, এবং সেজন্যই ক্রমে ক্রমে অবিচলগতিতে এদের পরিবর্তে স্থান নিচ্ছে সম্মতি, প্রত্যায়ন [persuasion], চয়ন এবং অনুরূপ অন্য সব কিছু। প্রথমোক্তরা নয়, শেষোক্তরাই ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণ করবে সব সম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়া— গৃহকর্তার ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে— এমন সবই।"

হরি নারায়ণ আপ্তের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে আগারকরের চিন্তা ও ধারণা এক নতুন মাধ্যমে উপস্থাপিত। স্ত্রীশিক্ষার রূপকার ঢণ্ড কাশব কার্ভে [Dhondo Kashav Karve] আগারকরের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। পরের প্রজন্মের সমস্ত প্রগতিশীল লেখক ও রাজনৈতিক কর্মীরা আগারকরকে তাঁদের প্রেরণার উৎস বলে স্বীকার করেন। তাঁর ব্রতের [mission] ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেখানোর জন্য আর বেশিদূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আজ তাঁর সব প্রবন্ধগুলি পড়ার পর মনে যে স্থায়ী ছাপ থেকে যায়, তা হল তাঁর সংবেদনশীল উঁচু মনের ব্যক্তিত্ব এবং যুক্তিনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাবাদ। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আত্মস্থ করেছেন। বিজ্ঞান-উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ও সমর্থক বিদ্যাবিশারদদের অবস্থানের অসংগতি দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর যুক্তি, তর্ক, সমর্থন ছিল নতুন মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে। ব্যক্তিকে একটা গন্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা শিকল তিনি হাতুড়ির আঘাতে ভাঙতে চেয়েছেন। বঞ্চিত লুণ্ঠিত মানুষদের দুর্দশার কথা তিনি দেখিয়েছেন আড়াল সরিয়ে আর সব দোষ আর অপরাধের দায় জড়ো করেছেন দোষী আত্মসন্তুষ্ট সমাজের দোরগোড়ায়। তিনি চাইতেন কাজ যেন চিন্তাকে অনুসরণ করে। আধুনিকতার হাওয়া যাতে মহারাষ্ট্রে ঢুকতে পারে, সেজন্য জানলা খুলে দিয়ে গেছেন তিনি।

অনুবাদে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের (ক) প্রচলিত বাংলা লিপ্যন্তর ও (খ) মান্য ইংরেজি উচ্চারণের কাছাকাছি রূপ

শব্দ	(ক)	(খ)
Matriculation	ম্যাট্রিকুলেশন	ম্যাট্রিকিউলে(ই)শান
College	কলেজ	কলিজ
Education	এডুকেশন	এডিউকে(ই)শান
Society	সোসাইটি	সাসাইআ টি
January	জানুয়ারি	জ্যানিউ আ রি

নীচে রেখাঙ্কিত আ বা া (আ-কার) এর উচ্চারণ হ্রস্ব আ। রেখা না থাকলে সাধারণ আ উচ্চারণ cut এর আ-র মত।

মুর্শিদাবাদের কাঁসা-পিতল শিল্প: অতীত-বর্তমান

সুনীতিকুমার মণ্ডল

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে ধাতু ব্যবহারের সম্পর্ক নিবিড় এবং সোনার মতো দামী ধাতু দিয়ে ৬০০০ থেকে ৮০০০ বছর আগে তার সূত্রপাত হয়েছিল। সোনার প্রায় সমসাময়িক বা কিছু পর মানুষ তামার ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল।

তামার পর ব্রোঞ্জ বা কাঁসা এবং পিতল ব্যবহার শুরু হয়েছিল। দুটিই অবশ্য সংকর ধাতু। তামা ও টিনের সংকর কাঁসা; আর পিতলে থাকে তামার সঙ্গে দস্তা। তামা গলাতে ১০৮৩° সে. উষ্ণতা লাগে। কাঁসার ক্ষেত্রে লাগে ৯৫০-১০৫০° সে. এবং পিতলের লাগে ৯০০-৯৪০° সে. (কাঁসা ও পিতলে কী অনুপাতে তামার সঙ্গে টিন বা দস্তা মিশে আছে তার ওপর গলনাঙ্কের তারতম্য হয়)। উভয় সংকর ধাতুই কম উষ্ণতায় গলানো যায় এবং তামার চেয়ে কঠিন। সেই কারণে তামার থেকে বেশি কাজের।

কাঁসার জন্যে টিন এবং পিতলের জন্যে দস্তা দরকার হয় বলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে সবের আবিষ্কারের পর কাঁসা ও পিতলের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। বাস্তবে কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। তামার সঙ্গে কখনো টিন, কখনো দস্তা বা অন্য ধাতুর কিছু না কিছু খাদ মিশে থাকে। তামা নিয়ে কাজ করতে করতেই কোন খাদ কী পরিমাণে থাকলে কী অবস্থা হয় তা দেখে শুনেই এক সময় এই সংকর ধাতু তৈরীর কৌশল আয়ত্তে এসেছিল। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে ৫০০০-৫৫০০ বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে কাঁসা আবিষ্কার হয়েছিল। সেখান থেকে চীন ও ভারতে এর ব্যবহারের বিস্তার ঘটেছিল (www.medwelljournals.com, www.ehow.com)।

কাঁসা তৈরীর সূচনার ঘটনা থেকে বোঝা যায় পিতলের আবিষ্কারও সমসাময়িক কিন্তু ঘটেছিল অজান্তে এবং তা ২৫০০ বছর ধরে কাঁসা বলেই মনে করা হয়ে এসেছিল। পিতলকে আলাদাভাবে তামা ও দস্তার সংকর হিসেবে জানার পরের ইতিহাস মাত্র ২৫০০ বছরের পুরনো (www.learnthebible.org)। ভারতে তামা ব্যবহারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। তাছাড়া সভ্যতা বিকাশের আদিপর্বে এদেশকেও তামা ও পিতল যুগের মধ্যে দিয়ে লৌহযুগে পৌঁছতে হয়েছিল। ভারতীয় পিতলকারদের অনেক বেশি দক্ষতার নমুনা দেখে অনেকে মনে করেন সম্ভবত ভারতবর্ষেই প্রথম পিতল আবিষ্কার হয়েছিল (বিজ্ঞানের ইতিহাস - পৃ ৪১)।

ভারতের মধ্যে আসাম, পশ্চিমবাংলা এবং উড়িষ্যায় কাঁসা ও পিতলের বাসন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। সে সবের উৎপাদনও তাই এই রাজ্যগুলিতে বেশি হয়। গুজরাট, জয়পুর, আলিগর, মোরাদাবাদ, বারাণসী এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু জায়গায় কাঁসা-পিতলের নানারকম শিল্প সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের ঘণ্টা, ঘুঙুর তৈরি হয়। এই নিবন্ধে অবশ্য মূলত মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসা ও পিতল শিল্পের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের বাসন বলতে লোকে মূলত বোঝে খাগড়ার বাসন। এক সময় বহরমপুর শহরের খাগড়া এলাকায় কাঁসা পিতল শিল্পের সঙ্গে জড়িত কংসবনিকদের বাস ছিল এবং ঘরে ঘরে বাসন ও অন্য সামগ্রী তৈরি হতো। ঐ মৌজার নামও তাই কাঁসারি বাজার। কিন্তু এই জেলার একমাত্র খাগড়াতেই বাসন তৈরি হয়ে আসছে তা নয়। খাগড়া সহ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্য জায়গায় কীভাবে কাঁসা পিতলের শিল্প গড়ে উঠেছিল তারও একটি ইতিহাস আছে, যার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ শহরের নবাবি আমলের সম্পর্ক আছে।

পনের থেকে ষোল শতকে প্রতিষ্ঠিত মুকসুদাবাদ বা মুখসুদাবাদ নামে পরিচিত গঙ্গার পূর্বপাড়ে অবস্থিত শহরে বাংলার প্রাদেশিক রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র ১৭০৪ সালে ঢাকা থেকে সরিয়ে এনেছিলেন বাংলার দেওয়ান মুর্শেদকুলি খাঁ। পরবর্তী সময়ে তাঁর নামেই শহরের নাম হয়েছে মুর্শিদাবাদ। ঢাকা থেকে রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র এখানে স্থানান্তরিত হবার পর এই অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে যায়। সে সময় অন্যান্য কুটির শিল্পের মতো কাঁসা পিতলের শিল্পও মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি অঞ্চলে (বড়নগর, ধননগর ইত্যাদি) সরে আসে। শোনা যায় মুঘল যুগের শেষের দিকে বাংলার নবাব আলিবর্দি খার আমলে বাংলায় বার বার বর্গী আক্রমণের সময় (১৭৪২-১৭৫১) ঐ অঞ্চল থেকে কাঁসা পিতল শিল্পের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষ চলে যান এবং বহরমপুরের খাগড়া; কান্দী, জঙ্গীপুর, পাঁচগ্রাম, জিয়াগঞ্জ এবং এ

জেলার বাইরে বীরভূমের টিকরবেতা, পাথরকুচি; নদীয়ার নবদ্বীপ, মাটিয়ারি (মাটিয়ালি), মুড়াগাছা; বর্ধমানের দাঁইহাট ইত্যাদি জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন।

খাগড়া ও কান্দীর কাঁসার বাসনের খুবই সুখ্যাতি ছিল এবং সারা ভারতে তার বিশেষ কদর ছিল। শুধু তাই নয় মুর্শিদাবাদের কাঁসা পিতলের সামগ্রী ভারতের অন্যান্য রাজ্য ছাড়াও দেশের বাইরে চালান যেতো। ১৯৪৪-৪৫ সালের তথ্যেও দেখা যায় বহরমপুরের খাগড়া এবং কান্দী কাঁসা-পিতল শিল্পে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। সে সময় কাঁসারি বাজার মৌজায় ১৮০ টি কাঁসা-পিতলের কারখানা ছিল এবং তার সঙ্গে তিন চার হাজার মানুষ যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বহু শিল্পীও ছিলেন। কান্দীতে তখন ৩২ টি কারখানা ছিল এবং সেখানে ২৫০ জনের মতো কারিগর কাজ করতেন।

১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে খাগড়ায় বহু দক্ষ কাঁসা শিল্পী ও কারিগর ছিলেন যাঁদের মধ্যে ঋষি মিস্ত্রী, সুধীর রঞ্জন মিস্ত্রী, গোবর্দ্ধন মিস্ত্রী, দুলাল মিস্ত্রী, পতিত পাবন মিস্ত্রী, কালিদাস কাঁসারি, বিষ্টু কাঁসারি, তারা কাঁসারি, ফনি চুটকি, দাশু মিস্ত্রী, বাঁকা কাঁসারির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১-৩২ সালে বৈদ্যনাথ দাসের কাঁসার ডিসে খোদাই করা জেনারেল তোজো ও রাজা হিরোহিতোর ছবি জাপানের প্রদর্শনীতে প্রশংসিত হয়েছিল।

১৯৪০ থেকে ১৯৯০-এর দশক মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধান। এ সময়ের মধ্যে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে; নগরায়নের গতি বেড়েছে, মানুষের জীবন যাপনের ধারা ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সে সবের ছাপ পড়েছে মুর্শিদাবাদের কাঁসা পিতল শিল্পের ওপর এবং শিল্পের সম্প্রসারণের পরিবর্তে সংকোচন ঘটেছে। ১৯৯২ সালের তথ্যে তাই খাগড়ায় মাত্র ৫ টি কাঁসা এবং গোয়ালজান, কুঞ্জঘাটা, কাঁসারি পট্টি মিলে ১৯ টি পিতলের কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়। আর কান্দীতে ছিল মাত্র ৫ টি কারখানা। কাঁসা পিতলের অন্যতম আদি জায়গা বড়নগরে তখন সব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

সে সময় বহরমপুর শহরে ৩০-৩৫ টি, কান্দীতে ১০ টি এবং জেলার অন্য শহরে দু একটি করে কাঁসা পিতলের বাসনের দোকান ছিল। কিন্তু সে সব দোকান থেকে যে সব জিনিস বিক্রি হতো তার সবই এ জেলার তৈরী, তা নয়। অন্য জেলা এবং রাজ্য থেকেও বিভিন্ন রকম বাসনসহ কাঁসা পিতলের সামগ্রী আমদানি হতো। যোগাযোগের সুব্যবস্থার জন্যে এর পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। জেলায় কাঁসা পিতল শিল্পের সংকোচনের ফলে দক্ষ শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যাও কমেছে। ১৯৯২ সালের তথ্যে বহরমপুর শহরে মাত্র পাঁচজন কাঁসা এবং পাঁচজন পিতলের শিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

কাঁসা পিতলের বাসন ও অন্যান্য সামগ্রী দুরকম উপায়ে তৈরী হয়। হাতুড়ি মেরে পিটিয়ে তৈরী হলে বলে পেটাই কাজ; আর

ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে তৈরী হলে বলে ঢালাই কাজ। এখানে দু ধরনের কাজই হয় কিন্তু কোথাও মৌলিক ধাতু মিশিয়ে কাঁসা পিতল তৈরী হয় না। এই অঞ্চলের কারখানার ধাতুর উৎস মূলত পুরনো কিংবা ভাঙাচোরা বাসন এবং কলকাতার বড়বাজার থেকে কেনা ধাতু।

আদর্শ কাঁসার ক্ষেত্রে তামা ও টিনের অনুপাত থাকে ৭৮:২২ কিংবা ৮০:২০ এবং পিতলের ক্ষেত্রে তামা ও দস্তা থাকে ৫৫:৪৫ কিংবা ৬০:৪০ অনুপাতে। কিন্তু বাসন এবং অন্য শিল্প সামগ্রী তৈরীর সময় এই অনুপাতের হের ফের ঘটানো হয় এবং অনেক সময় অল্প পরিমাণে অ্যান্টিমনি, সীসা কিংবা লোহা মেশানো হয়। বাদ্য যন্ত্রের ক্ষেত্রে কাঁসায় সাধারণত অ্যান্টিমনি যোগ করা হয়। মুর্শিদাবাদের খাগড়ার কাঁসার বাসনে তামা ও টিনের পরিমাণ থাকে ৭৮:২২ (৭:২) অনুপাতে; পিতলে তামা ও দস্তা থাকে ৬০:৪০ অনুপাতে এবং ভরণে তামা ও দস্তা থাকে সমান পরিমাণে (৫০:৫০)।

ঢালাই বা পেটাই যে কাজই হোক ভাঙাচোরা পুরনো বাসন বা পাত হিসেবে কেনা ধাতু প্রথমে গলিয়ে ধাতুর তাল বা পিন্ড তৈরী করতে হয়। ধাতু গলানো হয় পোড়ামাটির গেলাসের মতো পাত্রে যাকে বলা মুচি। স্থানীয় কারিগরেরা আগে নিজেদের প্রয়োজন মতো মুচি তৈরী করে নিতেন। এঁটেল মাটির সঙ্গে তুষ ও পাটের তন্তু মিশিয়ে মাটি তৈরী করে মুচি গড়া হতো। তারপর সেগুলি শুকিয়ে ঘুঁটের আগুনে পোড়ানো হতো। এখন কেউ তেমন মুচি তৈরী করেন না, তৈরী মুচি বড় বাজার থেকে কিনে আনেন। প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট বড় নানা আকারের মুচি ব্যবহার হয়।

মুচির মধ্যে গলানো ধাতুর তাল ঢেলে নিয়ে সাঁড়াশি দিয়ে ধরে আগুনে উত্তপ্ত করা হয় এবং লাল হলে সাঁড়াশি দিয়ে ধরে নেহাই-এর ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে প্রসারিত করা হয়। বেশ কয়েক বার গরম করা ও পেটানোর মাধ্যমেই এক সময় তা নির্দিষ্ট বাসনের রূপ পায়। এখানে নেহাই বলে যার উল্লেখ করা হয়েছে তা লোহার তৈরী ঘনক কিংবা গোলব্যাসের ১২-১৮ ইঞ্চি

উঁচু বেদী বা দন্ড যার ওপর ধাতু রেখে কাজ করা হয়। পেটানো হয়ে গেলে কাতান দিয়ে কেটে এবং উখা দিয়ে ঘসে প্রথমে কিনারা সমান করা হয়। তারপর পেটানোর দাগ তোলা হয় নেহালি দিয়ে চেঁছে। কাঠের হাতলযুক্ত বাটালির মতোই লোহার যন্ত্র নেহালি যার সামনের দিকটা একটু বাঁকানো থাকে। চাঁছার পর পালিশ হলেই তৈরী হয়ে যায় চকচকে ঝকঝকে বাসন। পেটাই বাসনের কাজ মুর্শিদাবাদ জেলার সাবেকী ঘরানার কাজ।

ঢালাই কাজের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন যে জিনিস তৈরী হবে তার ছাঁচ। তারপর গলানো তরল ধাতু ছাঁচে ঢেলে নির্দিষ্ট আকারের জিনিস তৈরীর প্রথম পর্যায়ের কাজটি করা হয়। ছাঁচ থেকে বের করার পর সেগুলিকে প্রয়োজন মতো পিটিয়ে, চেঁছে পালিশ করা হয়। ঘড়া, ঘটি, হান্ডা ইত্যাদিতে মূল আধারটি পিতলের পাত জুড়ে তৈরী হলেও গলা থেকে ওপরের অংশ ঢালাই কাজ এবং সেই অংশ আলাদাভাবে তৈরী করে সঠিক জায়গায় জুড়ে দেওয়া হয়। ঘড়ায় সব মিলে চার জায়গায় জোড় থাকে।

কাঁসা ও পিতলের জিনিস তৈরীর পদ্ধতি প্রায় একই রকমের। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের ক্ষেত্রে কলা কৌশলের তারতম্য আছে। এই কাজের জন্যে লোহার নানা রকম নেহাই; ১০-১২ রকমের হাতুড়ি; চার রকম শাবল (লকী শাবল, গোল শাবল, বাটি তৈরীর বেকী শাবল ও তিনমুখী শাবল); চাঁছার হাতিয়ার নেহালি ১০-১২ রকম; ২০-২৫ রকমের সাঁড়াশি; সরু মোটা নানা রকম ছেনি, টিপনি; হাতে তৈরী কম্পাস; পালিশ করার কুঁদ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়। বর্তমানে কারখানাগুলিতে আগুনের আঁচ বাড়ানোর জন্যে হাপরের পরিবর্তে ব্লোয়ার ব্যবহার হয় এবং কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ চালিত পালিশের মেশিন এবং ছোটখাট আরো কিছু যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু আর্থিক কারণে সকলে এসব যন্ত্র কিনতে পারেন না।

কাঁসা পিতল উভয়ই প্রধানত বাসন এবং নানা রকম শিল্প সামগ্রী তৈরীর জন্যে ব্যবহার হয়। গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় থালা, বাটি, গেলাস, ডিস্, পানের ডাবর, রেকাবি ইত্যাদি কাঁসার হয়। আর ঘড়া, গাড়ু, ঘটি, গামলা, হান্ডা, ডেক, বালতি, কড়াই ইত্যাদি ভারি জিনিস তৈরী হয় পিতল দিয়ে। পিতলের থালা, বাটিও তৈরী হয় কিন্তু সাধারণত সেসব পূজোর বাসন হিসেবে ব্যবহার হয়। তাছাড়া প্রদীপ, পিলসুজ, আরতির প্রদীপ ইত্যাদিও পিতলের হয়।

কাঁসার থালার মধ্যে মূলত দু রকমের থালা বেশি দেখা যায়—কাঁসি থালা এবং বগি থালা। কাঁসি থালার কানা উঁচু এবং এই থালা প্রাত্যহিক কাজে বেশি ব্যবহার হয়। কাঁসি থালার কোনোটির কানা খাড়া থাকে, কোনোটির একটু হেলানো থাকে। তা ছাড়া কানার উচ্চতাও কম বেশি থাকে এবং কোথাও কোথাও নকশা করা থাকে। কটকী, লতা, ছেচা, ভুবনেশ্বরী, গয়েশ্বরী ইত্যাদি অনেক রকমের কাঁসি থালা হয়। বগি থালার কানা উঁচু হয় না এবং সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে বিশেষ অতিথিদের বগি থালায় খেতে দেওয়া হয়। খাগড়ার বগি থালার বিশেষ সুখ্যাতি আছে। এক সময় এখানে পাঁচ রকমের (প্লেন্, গ্যাস, ডবল গ্যাস, সর্বসুন্দরী গ্যাস, দু রোখা বগি) বগি থালা তৈরী হতো। কানা ঢেউ খেলানো থাকলে তাকে বলে গ্যাস। ডবল গ্যাস বগি দূর থেকে দেখলে অনেকগুলি থালা বলে মনে হতো; আর সর্বসুন্দরীর মাঝখানটা এত চকচকে থাকতো যে মনে হতো সেখানে আলাদা একটা ডিস্ বসানো আছে। এখন একমাত্র প্লেন্ বগি থালা তৈরী হয়।

জল খাবার গেলাসও নানা রকমের হয় এবং আকার, আকৃতি ও নকশা অনুযায়ী সে সবের ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে—যেমন সরফুলি (গ্যাস), গয়া (প্লেন্), ঢাকনা দেওয়া গেলাস (সরপোষ), গামছা মোড়া গেলাস, আনারস গেলাস, তেথাকি গেলাস (তিনটে থাক যুক্ত) জামাই ঠকানো গেলাস, ধুতরো ফুল গেলাস, সানাই গেলাস ইত্যাদি। অধিকাংশ গেলাসই ঢালাই কাজ কিন্তু ধুতরো ফুল গেলাস, সানাই গেলাস পেটাই কাজ এবং এখন আর সেগুলি তৈরী হয় না।

থালা, গেলাসের মতো বাটিও নানা রকমের হয়। কোনো বাটি একটু গভীর কোনোটি চ্যাটালো, কারো কানা থাকে কারো থাকে না, কোনো বাটির কানা ঢেউ খেলানো এবং সেসবের ভিত্তিতে গয়া, তিলোকপল, গ্যাস বাটি (কানা ঢেউ খেলানো), আটপল, পাঁচ গে, জামবাটি, চিকন বাটি, কানখা বাটি, সরফুলি, নীলকান্ত ইত্যাদি প্রায় তিরিশ-চল্লিশ রকমের বাটি হয়। থালা, বাটি গেলাস ছাড়া নানা রকম রেকাবি এবং ডিস্ তৈরী হয়। গৃহস্থালি ব্যবহার ছাড়া কিছু ডিসের ওপর নানা ধরনের খোদাই কাজ করে ঘর সাজানোর শিল্প সামগ্রী তৈরী হয়।

প্রধানত কাঁসা পিতলের কাজ হলেও পূজা আর্চার কিছু সামগ্রী ভরণ দিয়ে তৈরী হয়। তাছাড়া পিতলের পাতলা চাদর (গোল্ডেন সিট) দিয়ে পালতোলা নৌকা, ছৈ দেওয়া গরুর গাড়ি, ঠাকুরের সিংহাসন, ফুল তোলার সাজি এবং নানা রকম ওয়াল প্লেট তৈরী হয়।

কাঁসা পিতলের বাসন এবং অন্যান্য সামগ্রী তৈরীর কাজ কুটির শিল্প। তাই বাসনের কারখানা বললে যে ছবি ভেসে ওঠে বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। পশ্চিমবাংলার দু একটি জেলায়

এবং অন্য রাজ্যে কাঁসা পিতলের কাজের আধুনিকীকরণ হয়েছে এবং বিদ্যুৎ চালিত নানা রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে। এ জেলার কেউ কেউ ছোট খাট বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র ব্যবহার শুরু করলেও অধিকাংশ জায়গায় এখনও সাবেকী পদ্ধতিতেই কাজ হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার সুখ্যাতি যে জায়গার বাসনের জন্যে খাগড়ার সেই কাঁসারি পাড়ায় গেলে এখন মন খারাপ হয়ে যায়। এক সময় ঐ এলাকায় ঢুকলে বাসন তৈরীর নানা রকম শব্দের সঙ্গে লোকজনের কথাবার্তা মিলেমিশে কর্মমুখর অঞ্চলের যে চিত্র ফুটে উঠতো এখন তা হারিয়ে গেছে। সরু গলির দু পাশে গায়ে গায়ে লাগানো বাড়িগুলি এখন শব্দহীন, শ্রীহীন। এখানে এখন মাত্র ১০টি জায়গায় কাঁসার কাজ হয় সাবেকী পদ্ধতিতে এবং কোনো রকমে সেগুলি টিকে আছে। তাছাড়া আটটি পালিশের কাজের জায়গা আছে। কাজের জায়গাগুলি খুবই সংকীর্ণ এবং সেখানে দু তিন জনের বেশি লোক একসঙ্গে বসে কাজ করতে পারে বলে মনে হলো না।

মনোরঞ্জন দাস (মানু দাস) এবং রাজ্য সরকারের পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী তেঁতুল দত্তের সঙ্গে কাঁসারি পাড়ায় দেখা হলো, কথা হলো। তেঁতুল দত্ত কাঁসার ডিসের ওপর বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি তৈরীর জন্যে ১৯৯১-৯২ সালে, ভারত মাতার প্রতিকৃতির জন্যে ১৯৯২-৯৩-এ, কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতির জন্যে ১৯৯৮-৯৯-এ পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তা ছাড়া বাটি তৈরীর জন্যে জেলাস্তরে গৌর রাজবংশীয় পুরস্কার পান ১৯৯৯-২০০০ সালে। কিন্তু পুরস্কার পাওয়া এমন শিল্পীর কাজের জায়গাও বড়ই সংকীর্ণ। ওঁর কাছেই ১৯৮৮ সালে প্রথম রাজ্য সরকারের পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ভবশঙ্কর দাঁর কথা শুনলাম। পুরস্কার পাবার সময় উনি অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন। পরে আর্থিক কষ্টে চিকিৎসার অভাবে প্রতিভাবান এই শিল্পীর মৃত্যু হয়েছিল। ভবশঙ্কর দাঁ আঙ্গুর পাতা, পেঁপে পাতা, তুঁত পাতা ইত্যাদি শিল্প সামগ্রী তৈরীতে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। আঙ্গুর পাতা তুঁত পাতা বেল পাতা এবং কাঁসার ডিসের ওপর নানা রকম নকশা, দেবদেবী, বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, শঙ্খ, মাছ, হাঁস, বক, ময়ুর ইত্যাদি এক সময় অনেকেই তৈরী করতেন। বর্তমানে এই সব কাজের দক্ষ শিল্পীর সংখ্যা খুবই কম।

কাঁসারি পাড়ার ঘরে ঘরে এক সময় কাঁসা-পিতলের কাজ হতো। সময়ের সঙ্গে সেসব বাড়িতে শরিকের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে যে সেখানে স্থানাভাব ঘটেছে। সেই কারণে অনেককে ঐ জায়গা থেকে সরে যেতে হয়েছে। তাছাড়া কাঁসা পিতলের কারিগরদের মজুরী কম বলে অনেকে বৃত্তি পরিবর্তন করেছেন। বর্তমানে কান্তনগরে ৪-৫ টি জায়গায় কাঁসা-পিতলের কাজ হয়। গোয়ালজানে ৭-৮ টি বাটি তৈরীর এবং ২-৩ টি হাতা চামচ তৈরীর জায়গা আছে। কুঞ্জঘাটায় প্রধানত পিতলের বড় বড় বাসনের কাজ হয় গোটা ৪০ বাড়িতে। তাছাড়া জিয়াগঞ্জে ৩ টি হাতা, চামচ, ডাবু ইত্যাদি তৈরীর জায়গা আছে। বড়নগরে বহুদিন আগে থেকেই কাঁসা পিতলের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। বাসন শিল্পের জন্যে যে কান্দীর সুনাম ছিল সেখানে এখন এক দুটি কারখানা কোনো রকমে টিকে আছে।

খাগড়ার কাঁসারি পাড়ার মন খারাপ করা ছবিটা বদলে যায় কুঞ্জঘাটায়। কাজের দিন পাড়ার ভেতর দিয়ে হাঁটলে বাড়িগুলি থেকে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনে কর্মব্যস্ততার ছবিটা খুব সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এখানে কাজের জায়গাগুলি বেশ প্রশস্ত এবং ৮-১০ জন একসঙ্গে বসে কাজ করা যায়। কারো কারো বাড়িতে একাধিক কাজের জায়গা আছে। কুঞ্জঘাটায় মূলত পিতলের ঘড়া, হান্ডা, গামলা ইত্যাদি বড় বাসন তৈরী হয়। ঘড়ার গলা থেকে ওপরের অংশ ঢালাই করে তৈরী হয়। কিন্তু কুঞ্জঘাটায় তৈরী হয় না; কাছেই ফরাসডাঙ্গার দুটি এবং গঙ্গার (ভাগীরথী) ওপারে গোয়ালজানের দুটি জায়গা থেকে কিনে আনতে হয়। ঘড়ার বাকি অংশ তৈরীর জন্যে মাপ করা আয়তাকার এবং গোলাকার পিতলের চাদর সাধারণত বাসন ব্যবসায়ীরা কলকাতা থেকে কিনে কারিগরদের সরবরাহ করেন।

কুঞ্জঘাটায় পিতলের কাজের জন্যে যদুগোপাল কংসবনিক, নীলরতন কংসবনিক, সুরেশ কংসবনিক, গোবিন্দ কংসবনিক, প্রদীপ কংসবনিক, তারকনাথ কংসবনিকের মতো অনেক দক্ষ শিল্পী ও কারিগর আছেন। প্রবীন মানুষ যদুগোপাল কংসবনিক ও তাঁর ছেলে তারকনাথ কংসবনিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তাঁরা নানা ধরনের কাজে দক্ষ কিন্তু বর্তমানে কেবল ঘড়া তৈরী করেন। পিতলের পাতের অন্য ধরনের কাজের প্রতি তারকনাথের বিশেষ ঝোঁক আছে। বহরমপুরের ভট্টাচার্য পাড়ায় ২০০৬ সালে পিতলের পাতের দুর্গাপূজার প্যান্ডেল করে তিনি সকলের প্রশংসা পেয়েছিলেন।

সাবেকী প্রথার কাজে পরিশ্রম অনেক বেশি এবং তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক মেলে না। অনেক কারিগর তাই অন্য বৃত্তিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, বেশি রোজগারের আশায় অনেকে জেলা ছেড়েছেন। দক্ষ কারিগরদের বেশির বাগই তাঁদের সন্তান সন্ততিদের চাকরি বা অন্য বৃত্তি গ্রহণের জন্যে উৎসাহিত করছেন। ফলে পরের প্রজন্মের অনেকেই পারিবারিক বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। বছর ১০-২০ আগে এ সব কারণেই মুর্শিদাবাদ বিশেষ করে বহরমপুরে কাঁসা পিতলের কাজের সংকোচন ঘটেছিল।

এখন অবস্থাটা একট পালটেছে। কারিগরদের পারিশ্রমিক কিছুটা বেড়েছে। কাজও বেড়েছে বহুগুণ। তাছাড়া অন্যত্র কাজ পাওয়াটাও খুব সহজ নয়। এ সব কারণেই বহরমপুরের আশে পাশে কাঁসা পিতলের কারখানা ১৯৯২-এর তুলনায় বেড়েছে। অস্বাভাবিক হারে মানুষ বেড়েছে এবং বাড়ছে। সেই সঙ্গে সব

কিছুর মতো বাসনের চাহিদাও বেড়েছে। স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম বাসনের ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষের মধ্যে পিতল-কাঁসার বাসনের চাহিদা কমেনি বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে বেড়েছে। গ্রামের মানুষের কাছে আজো কাঁসা-পিতলের বাসন অস্থাবর সম্পত্তি কারণ পুরনো হলেও তার দাম পাওয়া যায়। এখন নতুন কাঁসার বাসনের দাম কেজি প্রতি ৬৫০-৭০০ টাকা এবং পুরনো বাসনের দাম কেজি প্রতি ৫৩০-৫৪০ টাকা। পিতলের ক্ষেত্রে নতুন বাসনের দাম কেজি প্রতি ৩৩০-৪০০ টাকা এবং পুরনো কেজি প্রতি ২৪০-২৫০ টাকা।

শুধু গ্রামে মানুষ বেড়েছে এবং তারাই কেবল কাঁসা পিতলের বাসন কেনেন তা নয়। কম হলেও শহরের মানুষও কাঁসা পিতলের বাসন কেনেন। তাছাড়া শহরে মানুষ বাড়ার সঙ্গে পিতল কাঁসার উপহার সামগ্রী এবং ঘর সাজানোর নানা রকম সৌখিন শিল্প সামগ্রীর চাহিদা বেড়েছে। চাহিদার সঙ্গে এ জেলার উৎপাদন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বহুদিন থেকেই এবং এক সময় তৈরী হতো এমন বহু রকমের বাসন এখন আর তৈরী হয় না। অথচ পশ্চিমবাংলার কয়েকটি জেলায় এখন কাঁসা পিতলের বাসন ও অন্যান্য জিনিস তৈরী হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। তার মধ্যে বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া; নদীয়ার নবদ্বীপ, মাটিয়ারি, মুড়াগাছা; দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারাসতের কাছে দত্তপুকুর এবং বীরভূমের দুবরাজপুর ও পাথরকুচি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাঁকুড়া জেলায় দারকেশ্বর নদীর ধারে কাঁসা পিতলের কাজের সঙ্গে জড়িত কেঞ্জাকুড়ার জনপদ দেড়শ বছরের পুরনো। বর্তমানে তিনশ'র মতো পরিবার এবং আড়াই হাজারের মতো লোক এই কাজের সঙ্গে যুক্ত (www.eepcindia.org)।

খাগড়ার বাসনের সুখ্যাতির জন্যে আজো এখানের বাসন খুব কম হলেও অন্য জায়গায় যায়। আবার এখানেও অন্য জায়গা থেকে কাঁসা পিতলের বাসন আনতে হয়। বহরমপুরে বাসনের পুরনো দোকানগুলিতে খোঁজ নিলেই জানা যায় এখানে কাঁসা পিতলের যত জিনিস বিক্রি হয় তার ৭০-৭৫ শতাংশ রাজ্যের অন্য জেলা এবং অন্য রাজ্য থেকে আনতে হয়। আনতে হয় বাসনের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জন্যে এবং খাগড়ার বাসনের তুলনায় অন্য জায়গায় মেসিনে তৈরী হালকা, দামে কম বাসনের চাহিদা বেশি বলে। এখানে বিক্রি হয় এমন বাসনের অনেকটাই আসে কেঞ্জাকুড়া এবং নবদ্বীপ থেকে। তাছাড়া জলের জাগ, বালতি, গেলাস আসে মাটিয়ারী এবং মুড়াগাছা থেকে; গাড়ু, বদনা আসে ঘাটাল থেকে। দেবদেবীর ছাঁচের ঢালাই মুর্তিগুলি আসে নবদ্বীপ, বারাণসী, আলিগর এবং বৃন্দাবন থেকে। মিনে করা ওয়াল প্লেট, নানা রকম ফুলদানি, মোমদানি, জিরাফ, হরিণ, বক, হাঁস, মাছ ইত্যাদি যে সব ঘর সাজানোর জিনিস এখানে পাওয়া যায় সেগুলি এখানে তৈরী হয় না, আসে জয়পুর, মোরাদাবাদ ইত্যাদি জায়গা থেকে।

গ্রামাঞ্চলে বিয়ের যৌতুক হিসেবে থালা, বাটি, গেলাস, প্রদীপ, গাড়ু, পানের বাটা ইত্যাদির সঙ্গে বড় গামলা, ডেক, হান্ডা, বালতি দেবার প্রচলন ১৫-২০ বছর আগেও ছিল। গ্রামের যে কোনো বাড়ির উৎসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাড়ি থেকে সে সব বড় বাসন জড়ো করেই হাজার দু হাজার মানুষের ভোজের আয়োজন হয়ে যেতো। এখন অবস্থাটা বদলেছে। অনেক জায়গায় বারোয়ারী সম্পত্তি হিসেবে ভোজ কাজের উপযুক্ত বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও শহরের মতো গ্রামেও ক্যাটারারদের সাহায্য পাওয়া সহজ হয়েছে। বাড়িতে বড় বাসন রাখার প্রয়োজন সে জন্যে অনেক ক্ষেত্রে কমেছে। স্বাভাবিকভাবেই বড় বাসন দেবার চল কমেছে। বড় বাসন বিক্রিও সেই কারণে কিছুটা কমেছে; কিন্তু পিতল কাঁসা বাসনের বিক্রি বেড়েছে বহুগুণ এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য শিল্প সামগ্রীর চাহিদা বেড়েছে এ কথা বহরমপুরের কয়েকটি বড় বাসনের দোকানে গেলেই জানা যায়।

আগের আলোচনায় দেখা গেছে এখানে কাঁসা পিতলের যত জিনিস বিক্রি হয় তার সিংহভাগই আসে অন্য জেলা এবং রাজ্য থেকে। এ জেলায় দক্ষ কারিগরের অভাব নেই এবং তাঁদের দিয়ে আমদানি করা বাসনের মতো বাসন এবং শিল্প সামগ্রী তৈরী করানো অসম্ভব নয়। তবে তার জন্যে বর্তমান সময়ের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভাবতে হবে এবং গতানুগতিক ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে। তার মধ্যে প্রথম হলো পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কুটির শিল্পের সাবেকী কাজের ধরনের আধুনিকীকরণ হলে কেবল উৎপাদন বাড়বে তা নয়, তুলনা মূলক কম দামের হালকা বাসন, যার চাহিদা বেশি, তাও তৈরী করা যাবে। খাগড়ার কাঁসা গুণমানের জন্যে বিখ্যাত; সেই মান বজায়

রেখেও আধাযান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা করা সম্ভব। এর জন্যে দরকার অর্থ। দেশের নানা রকম কুটির শিল্প বিকাশের জন্যে সরকারি মধ্যস্থতায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণের বিষয়টি আরো সহজ সরল হওয়া দরকার এবং তার জন্যে সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন আছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এখন এখানে মৌলিক ধাতু মিশিয়ে কাঁসা পিতল তৈরী হয় না। ধাতুর উৎস পুরনো বা ভাঙাচোরা বাসন এবং কলকাতা থেকে কেনা ধাতুর চাদর। কিন্তু তার গুণমান নিয়ে কারিগররা সন্তুষ্ট নন। তাছাড়া কাঁচামাল সরবরাহ হয় বাসন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। এই শিল্পের উন্নতির জন্যে কারিগররা যাতে সরাসরি কাঁচা মাল কিনতে পারেন তার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা দরকার।

কাঁসা পিতলের কারিগরদের বর্তমান মাসিক আয় ছয় থেকে সাত হাজার টাকা এবং সহযোগী কারিগরের আয় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা। পরিশ্রমের তুলনায় এই দুর্মূল্যের বাজারে পারিশ্রমিক খুবই কম। এটা বাড়ানো দরকার। আয় বাড়লে দক্ষ কারিগরদের এই শিল্প ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সংখ্যা কমবে। আসলে এখনও কাঁসা-পিতল শিল্প বাসন ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। সে জন্যে বাসনের ব্যবসা বহুগুণ বাড়া সত্ত্বেও কারগিরদের অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয় নি। শিল্পী ও কারিগরদের সমবায় গড়ে তার মাধ্যমে কাঁচামাল সরবরাহ থেকে পাইকারি ও খুচরো বাসন বিক্রি পর্যন্ত সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হলে অবস্থার উন্নতি হবে বলে মনে হয়।

আরো যা করা দরকার তা হলো সাবেকী কাজের সঙ্গে বর্তমান চাহিদার সামঞ্জস্য রেখে পিতল কাঁসার নতুন সামগ্রী তৈরী করা। এর জন্যে কারিগরদের সে সব কাজ শেখা দরকার। সরকারি উদ্যোগে মাঝে মধ্যে সে রকম ব্যবস্থা হয়। ২০০৮ সালের ৩১শে মার্চ অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল এবং গত দু-আড়াই বছরে কাঁসা পিতলের বিভিন্ন রকম কাজ শেখানোর জন্যে অনেকগুলি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয়েছে। এ বছর কেন্দ্রীয় সরকারের Ministry of Textiles-এর আওতাধীন Development Commissioner - Handicrafts-এর উদ্যোগে বহরমপুরের কুঞ্জঘাটায় ৮ই নভেম্বর থেকে ২৮শে নভেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)। সেখানে ৫০ জন কারিগরকে জয়পুর ও মোরাদাবাদের শিল্পীরা ঢালাই-এর নানা রকম শিল্প সামগ্রী তৈরী শিখিয়েছেন। খুবই ভাল উদ্যোগ। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় পরিকাঠামোর অভাবে, অর্থের অভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা সাবেকী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না।

প্রশিক্ষণের দরকার আছে কিন্তু শুধু প্রশিক্ষণই সমাধান নয়। দরকার সে সব প্রয়োগ করার মতো পরিকাঠামো এবং আর্থিক সহায়তা। কারিগরেরা এক জোট হয়ে সে রকম ব্যবস্থা করতে পারেন এবং সেটা করা দরকার। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কাশিমবাজারে ৩০ কাঠা জমিতে কাঁসা পিতলের কাজের সুবিধার জন্যে একটি "কমন ফেসিলিটি সেন্টার" গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। সেখানে এই কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকবে এবং স্থানীয় শিল্পী ও কারিগরেরা তার সুবিধা নিতে পারবেন। অনেক দেরী হয়ে গেছে, তাও এই উদ্যোগ কাঁসা পিতল শিল্পকে উজ্জীবিত করবে বলে আশা করা যায়। কাঁসা পিতল শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন এমন সব মানুষের আন্তরিক ইচ্ছা এবং সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ এর সঙ্গে যুক্ত হলেই প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১। বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) - সমরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৯৪।

২। কাঁসা, পেতল শিল্প - সুজাতা দে, পৃ. ৩১৯; মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার নভেম্বর ২০০৩।

৩। ইনটারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট।

৪। খাগড়ার কাঁসারি পাড়া ও কুঞ্জঘাটার কয়েকজন কারিগরের সাক্ষাৎকার।

৫। খাগড়ার বেশ কয়েকটি বাসনের পুরনো দোকানের মালিকদের সাক্ষাৎকার।

[এই প্রবন্ধ রচনার তথ্য সংগ্রহে আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে কাঁসারিপাড়ার তেঁতুল দত্ত, মনোরঞ্জন দাস; কুঞ্জঘাটার তারকনাথ কংসবনিক; খাগড়ার বীনা স্টোর্স-এর মালিক দেবাশিস দাঁ এবং শুভাশিস দাঁ-র (আমার এক সময়ের প্রিয় ছাত্র) কাছে আমি কৃতজ্ঞ]

উ মা

অ্যাম্বুলেন্স যখন ব্যবসা

ভবানীপ্রসাদ সাহু

অ্যাম্বুলেন্স বলতেই এমন এক দ্রুতগামী গাড়ির ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যে এক মুমূর্ষু রোগিকে নিয়ে জরুরি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ছুটে যাচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স শব্দটির সাধারণ আভিধানিক অর্থও তাই—রোগি পরিবহনের যান। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এটি 'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটির পরিবর্তিত অর্থ। এর মূল অর্থ ছিল ভ্রাম্যমান হাসপাতাল বা চিকিৎসালয়। যে মূল ফরাসি শব্দ আম্বুলাতেঁ (ambulant), হাসপাতাল প্রসঙ্গে তার অর্থ ভ্রাম্যমান। ভ্রাম্যমান ল্যাটিন শব্দ অ্যাম্বুলেয়ার (ambulare) থেকে এসেছে অ্যাম্বুল্যান্ট কথাটি, যার অর্থ ভ্রাম্যমান থেকে এর সৃষ্টি, তার অর্থও তাই। সংসদ অভিধানেও 'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটির অন্যতম অর্থ দেওয়া আছে, বিশেষত সৈন্যবাহিনীতে ব্যবহৃত ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র।

স্পষ্টতই অ্যাম্বুলেন্সের ধারণার মূলে ছিল হাসপাতাল থেকে দূরে আহত বা অসুস্থ রোগিকে চিকিৎসা করার পাশাপাশি, হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া, যেখানে আরো সুষ্ঠুভাবে তার চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু আমাদের চারপাশে আমরা সাধারণত যে অ্যাম্বুলেন্স দেখি তাতে চিকিৎসার ব্যাপারটা গৌন, প্রায় নেই বললেই চলে; মুখ্য ব্যাপারটি থাকে যত দ্রুত সম্ভব রোগিকে হাসপাতালে (বা নার্সিং হোমে) পৌঁছে দেওয়া।

তবে অ্যাম্বুলেন্সে রোগি পরিবহনের সময় ন্যূনতম দু'একটি ব্যবস্থা রাখতেই হয়, যেমন অক্সিজেন সিলিন্ডার, হাত মুখ ধোওয়ার বেসিন, রোগিকে ওঠানো-নামানোর জন্য স্ট্রেচার, বড়জোর ফার্স্টএড বক্স। এছাড়া গাড়ির ভেতরের জায়গাটা একটু খোলামেলা রাখা, পাখার ব্যবস্থা ও সঙ্গের দু'তিনজনের বসার জায়গা রাখা হয়। আমজনতার অ্যাম্বুলেন্স—এরকমই।

কিন্তু ভি ভি আই পি-দের জন্য অ্যাম্বুলেন্স-এর এলাহি ব্যবস্থা দেখে তাক লেগে যায়। রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীদের চলাচলের সময় এমন অ্যাম্বুলেন্স তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে যায়, কাজে লাগুক না লাগুক, তিনি আদৌ অসুস্থ হোন বা নাই-ই হোন। এগুলি হচ্ছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সুপার স্পেশালিটি অ্যাম্বুলেন্স, কিছুদিন আগে এ রাজ্যে এমন একটি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য যে সব সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার দীর্ঘ তালিকাটি এই রকম—

(১) কার্ডিয়াক ডিফিব্রিলেটর (আন্তর্জাতিক মানের সর্বোত্তম প্রযুক্তির রেকটিলিনিয়ার বাইফেজিক ওয়েভফর্ম জোল এম সিরিজ)—হঠাৎ হৃদপিন্ড বন্ধ হয়ে গেলে এটি ব্যবহার করা হয়।

(২) পোর্টেবল ভেন্টিলেটর (অ্যাম্বুলেন্সের জন্য পরীক্ষিত প্রযুক্তিসহ ই আর ১০০)—শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে এটি ব্যবহার করা হয়।

(৩)পোর্টেবেল আলট্রাসাউন্ড স্ক্যানার (সম্পূর্ণ সফটওয়ারসহ সবচেয়ে শক্তপোক্ত ও সুসংবদ্ধ)

(৪) পোর্টেবেল ইসিজি মেশিন (তাৎক্ষণিকভাবে স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থাসহ ৬ চ্যানেলের)

(৫) এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব— শ্বাসনালীতে বসানোর জন্য

(৬) ল্যারিঙ্গোস্কোপ—মুখের ভেতর ঢুকিয়ে ল্যারিংক্স পরীক্ষা করার জন্য

(৭) সাকশান অ্যাপারেটাস— শ্বাসনালী থেকে আটকে থাকা কফ বের করানোর জন্য

(৮) অ্যাম্বুব্যাগ— হঠাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে ব্যবহার করার জন্য

(৯) অক্সিজেন সিলিন্ডার ও মাস্ক

(১০) কাট ডাউন সেট— চামড়া কেটে শিরার মধ্য দিয়ে ওষুধ দেওয়ার জন্য

(১১) মিনি ট্রাকিওটোমি সেট— হঠাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে শ্বাসনালী কাটার জন্য

(১২) বিভিন্ন ধরনের ইনট্রাভেনাস ফ্লুইড এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

(১৩) নেবুলাইজার

(১৪) স্প্লিন্ট, সার্ভাইক্যাল কলার— হাড় ভেঙ্গে গেলে লাগানোর জন্য ও ঘাড়ে চোট লাগলে ঘাড়ে লাগানোর জন্য

(১৫) স্পাইনাল স্ট্রেচার

(১৬) ব্যান্ডেজ, টুর্নিকেট

(১৭) সেলাইয়ের যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র

(১৮) ফোলিস ক্যাথেটার—প্রস্রাব আটকে গেলে পরানোর জন্য

(১৯) চেস্ট টিউব, ব্যাগসহ

(২০) ড্রেসিং ড্রাম

(২১) ইনভার্টার (শব্দহীন, ১.৪ কেভিএ, শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য

(২২) স্টেথোস্কোপ, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, থার্মোমিটার, ওজন মাপার যন্ত্র, ফিতা ইত্যাদি

(২৩) বহনযোগ্য টর্চ, দেওয়ালে ঝোলানোর আয়না, ডিজিটাল ঘড়ি, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, তোয়ালে রাখার জায়গা

(২৪) নী হ্যামার— নার্ভতন্ত্রের কাজ পরীক্ষা করার জন্য

(২৫) সার্জিক্যাল স্টেরিলাইজার—জীবাণুমুক্ত করার জন্য

(২৬) কোল্ড স্টোরেজ (ভ্যাক্সিন রাখার জন্য)

(২৭) ফার্স্ট এইড-এর জিনিসপত্র

(২৮) হিমোগ্লোবিনোমিটার— রক্তের হিমোগ্লোবিন মাপার জন্য

(২৯) যন্ত্রপাতি রাখার ট্রে

(৩০) নিডল কাটার

(৩১) আসবাবপত্র: ভাঁজ করা যায় এমন নাট, ডাক্তার, নার্স ইত্যাদির জন্য চেয়ার, স্টুল

(৩২) ফোল্ডিং স্কুপ স্ট্রেচার

(৩৩) পোর্টেবেল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার— ধুলোময়লা পরিষ্কার করার জন্য

(৩৪) কিছু স্টেশনারি জিনিসপত্র

(৩৫) ডাস্টবিন (পা দিয়ে চালানোর মত); সংক্রামক ও অসংক্রামক জঞ্জালের জন্য আলাদা আলাদা

(৩৬) রুম হিটার

(৩৭) অক্সিজেন কনসেনট্রেটর

(৩৮) বিভিন্ন ধরনের ক্যাথেটার

(৩৯) ইনট্রাভেনাস ফ্লুইড স্ট্যান্ড।

এছাড়া সঙ্গে যায় বেশ কয়েকজন চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ান।

স্পষ্টতই ভি ভি আই পিদের এই ধরনের সুপার স্পেশালিটি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য বেশ কয়েক লক্ষ সরকারি টাকা ব্যয় করা হয়। এবং তার মূল উদ্দেশ্য জরুরি অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই যাতে ঐ ভি ভি আই পি-র চিকিৎসা করা যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটা পরবর্তী গুরুত্বের ব্যাপার।

আমজনতার অ্যাম্বুলেন্সে এই ধরনের এলাহি জীবনদায়ী ব্যবস্থা প্রত্যাশা করা যায় না, অন্তত আমাদের মত দরিদ্র দেশে। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স মানেই অত্যন্ত অসুস্থ ও মুমূর্ষু রোগিকে স্থানান্তর করা। এর জন্য বেশ কয়েক ঘণ্টা সময়ও লাগতে পারে। আর এর মধ্যে রোগির কিছু হয়ে গেলে নাকে শুধু অক্সিজেনের নল গুঁজে দেওয়া ছাড়া সঙ্গের লোকজনের কিছু করার থাকে না, তাও যদি ঐ অক্সিজেন সিলিন্ডারে অক্সিজেন থেকে থাকে এবং তার নল-টলগুলো ঠিকঠাক থাকে। কারণ প্রায়শই যা হয়, অ্যাম্বুলেন্সটি চালু করার সময় হয়তো ঐ সিলিন্ডার ঢোকানো হয়েছিল; তার পর দীর্ঘদিন কেটে গেছে, সেটি আর পরীক্ষাও করা হয় নি, কাজেও লাগানো হয় নি। আর এই ধরনের অ্যাম্বুলেন্সে রোগির সঙ্গে কোন চিকিৎসকও থাকে না, যদি না রোগির বাড়ির লোকজন নিজেদের উদ্যোগে কোন চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে একজন চিকিৎসক থাকার ব্যাপারটায় কোন বাধ্যতামূলক নিয়মকানুন নেই। আর তিনি থাকলেও যদি জীবনদায়ী ওষুধপত্র, ইনজেকশন দেওয়ার সরঞ্জাম— ইত্যাদির মত ন্যূনতম জিনিসপত্র যদি না থাকে, তবে তাঁরও সাধারণ কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি হাত কামড়ানো ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার থাকে না।

এ প্রসঙ্গে নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলা যায়। কয়েক বছর আগে আমাকে তখন দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে সপ্তাহে দু'তিনদিন যাতায়াত করতে হত। ডেলি প্যাসেঞ্জার (ডেলি পাষণ্ড!) না হলেও, তাঁদের সঙ্গে আসতাম এবং ছোটখাট ডাক্তার হলেও ঐ সুবাদে একটু সম্ভ্রম পেতাম। এমনই একদিন সকালে কলকাতা আসার পথে ঐ কামরায় একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধানবাদ থেকে তিনি আসছেন কলকাতার সল্ট লেকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে দেখাবেন বলে। হার্টের রোগি। ট্রেনে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা সিট ছেড়ে দিয়ে তাঁকে শুইয়ে দিলেন এবং ডাক্তার হওয়ার সুবাদে আমাকেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন। বড় কোন ডাক্তার নই, হৃরোগ বিশেষজ্ঞ তো নই-ই, তবু যেতে হল এবং কিছু করতেও হল। গিয়ে দেখি, নাড়ি (ক্যারোটিড পাল্‌স্‌) প্রায় নেই, অজ্ঞান হয়ে গেছেন, মুখের কোণে সামান্য ফেনা। রক্তচাপ মাপার যন্ত্র নেই সঙ্গে। শুধু স্টেথোস্কোপটা ছিল। তাই বুকে বসিয়ে অশনি সঙ্কেত পেলাম, হৃদস্পন্দনের শব্দ আছে

কি নেই। দ্রুত যতটা পারি ঐ চলন্ত ট্রেনেই কার্ডিয়াক ম্যাসেজ দিতে থাকলাম এবং মাঝে মাঝে নাকের নিচে একটি বিন্দুতে নখ দিয়ে সজোরে চাপ দিতে থাকলাম। (এই বিন্দুটিতে সূচ ফোটালে বা জোরে চাপ দিলে হঠাৎ কমে যাওয়া রক্তচাপ অর্থাৎ শক অবস্থার উন্নতি ঘটে বলে আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতিতে বলা হয়। বিন্দুটির চীনা নাম রেনচুং; আন্তর্জাতিক পরিচয়— পৃ২৬)

আনন্দের বিষয় কয়েক মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোক চোখ মেলে চাইলেন। নাড়ি পাওয়া গেল। হৃদস্পন্দনের শব্দও পাওয়া গেল। বাড়ির লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং তারপর একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিলেন। ওঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন রোগিকে হাওড়া থেকে ট্যাক্সি করে সল্টলেক নিয়ে যাবেন। কিন্তু এখন ঠিক করেছেন ফোনে একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নেবেন এবং আমাকে অনুরোধ করলেন হাসপাতাল অব্দি সঙ্গে যেতে। ওঁদের উদ্বিগ্ন অনুরোধ ফেলা গেল না। আমার কর্মক্ষেত্রে পৌঁছতে দেরি কিছুটা হবে হয়তো, কিন্তু রোগির ঐ অবস্থা, তার ওপর ট্রেনে সামলে দিতে পেরেছিলাম, বাড়ির লোকজন আর ছাড়তে চাইলেন না। কয়েক জায়গায় ফোন করে উত্তর কলকাতার ক্লাবের একটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা হল। হাওড়া পৌঁছতে পৌঁছতে সেটি চলে আসবে।

এসেও ছিল। ক্যাবওয়েতেই দাঁড়িয়ে ছিল সেটি। রোগি আর বাড়ির দু'একজনের সঙ্গে আমিও গেলাম। বাকিদের জায়গা নেই। ওঁরা ট্যাক্সিতে গেলেন। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরটি মোটামুটি পরিষ্কার। মরচেধরা একটি অক্সিজেন সিলিন্ডারও আছে। বিপদ হল হাওড়া ব্রিজ পেরিয়েই জ্যাম শুরু হল। আর ঐভাবে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই রোগির আবার আগের মত অবস্থা হল। অক্সিজেন দিতে গিয়ে দেখি সিলিন্ডারের পাশে লাগানো যে পাত্রে জল থাকার কথা এবং যে জলের মধ্য দিয়ে অক্সিজেন বুদ্বুদাকারে বেরিয়ে নল দিয়ে রোগির নাকে যায় ঐ পাত্রে ঐ জল একেবারে তলানিতে। নলটি নাকে গুঁজে দিলেও আদৌ অক্সিজেন যাচ্ছে কিনা বোঝার উপায় নেই। তবু মানসিক সান্ত্বনা— কিছু একটা রোগির নাকে গোঁজা হয়েছে। ডেকাড্রন, ডেরিফাইলিনের মত সাধারণ কোন ওষুধপত্রও নেই। ইনজেকশান দেওয়ার সিরিঞ্জ ইত্যাদিও নেই (থাকলেও বা কি লাভ)। তাই আবার ঐ কার্ডিয়াক ম্যাসেজ, নাকের নিচে রেনচুং বিন্দুতে সজোরে চাপ এবং আমাদের সবাইকে আশ্বস্ত করে রোগির আবার চোখ মেলা, তীব্র হর্ন বাজিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ততক্ষণে পথ করে নিয়েছে। তখন মনে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের পথ চাওয়ার ঐ হর্নের তীব্র শব্দ আবার না রোগির বিপদ ডেকে আনে। না, অন্তত আমাকে স্বস্তি দিয়ে রোগির আর বিপদ ঘটে নি। সল্টলেকের ঐ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আমার ছুটি।

এবং তখনি, অ্যাম্বুলেন্স ভ্রমণের ঐ অভিজ্ঞতা থেকে এটি অনুভব করা গেল যে, রোগি পরিবহনের ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা থাকলেও, তার ভেতর রোগির তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার কোনও উপযোগিতা প্রায় নেই। এ প্রসঙ্গে আরেকটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথাও শুনলাম। এই ২০১০-এর প্রায় মাঝামাঝি এক ভি ভি আই পি-র কলকাতা সফরের সময় পূর্বোক্ত ভি ভি আই পি সুপার স্পেশালিটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা ছিল। তাতে সঙ্গে যাওয়া চিকিৎসকের মধ্যে ছিলেন আমার এক পরিচিত সহকর্মী। তাঁর কাছ থেকে শুনলাম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঝাঁ চকচকে ঐ অ্যাম্বুলেন্সে যন্ত্রপাতি ওষুধপত্র প্রচুর। কিন্তু ওষুধগুলো দেখতে গিয়ে দেখা গেল তার অধিকাংশেরই নির্ধারিত সময় (এক্সপায়ারি ডেট) পেরিয়ে গেছে, কয়েকটির পেরোবে পেরোবে করছে (শর্ট ডেট)। অর্থাৎ যে পরিবেশক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে সুপার স্পেশালিটি অ্যাম্বুলেন্সটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সে কি কি জিনিসপত্র দিচ্ছে তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা আর করা হয় নি। যে সব যন্ত্রপাতি দিয়েছে তা হয়তো মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওষুধগুলো আর আলাদা করে দেখা হয় নি। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আয়োজন করা ঐ ভি ভি আই পি-দের জন্য সুপার স্পেশালিটি অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা হয় তবে আমজনতার সাধারণ অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রে নজরদারির কি অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিবহন আধিকারিকও এই কথাই জানালেন। তিনি স্পষ্টই বললেন, অন্তত আমাদের দেশে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে রোগির চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। শুধু মাত্র 'রেফার' করা রোগির বা মুমূর্ষু রোগির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তার ব্যবহার করা হয়। তবে বড় জোর ঐ অক্সিজেন সিলিন্ডার, হাত ধোওয়ার বেসিন, স্ট্রেচার, ফার্স্ট এইড বক্স (তাতে যাই থাকুক বা না থাকুক না কেন)— এসব থাকলেই যথেষ্ট। অ্যাম্বুলেন্স করার জন্য তাঁর অনুমতিরও দরকার নেই। তাঁর মতে অ্যাম্বুলেন্স করার অনুমতি চেয়ে অনেকে তাঁর কাছে যে চিঠি দেয় তা 'ফালতু'। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কোনও গাড়ি রেজিস্ট্রি করার সময় 'অ্যাম্বুলেন্স' হিসেবে ব্যবহার করা হবে—এমন ঘোষণা করাই যথেষ্ট। যে কোম্পানির গাড়ি নেওয়া হবে তাদের তা জানালে তারা গাড়ির ভেতরটা ঐভাবে বানিয়ে দেয় অথবা গাড়ি নিয়ে নিজেদের তা করে নিতে হয়। (যেমন রোগির শোওয়ার জায়গা ও স্ট্রেচার রাখা, পাশে দু'চারজনের বসার ব্যবস্থা বেসিন ও ফার্স্ট এইড বক্স রাখার জায়গা, ওপরে আলো, হর্ন ইত্যাদি)। গাড়ির গায়ে রেডক্রশ লাগানো, 'অ্যাম্বুলেন্স' কথাটি লেখা—এসব তো আছেই। এখন অবশ্য কোনও রাজনৈতিক নেতার সদিচ্ছায় ও সাহায্যে হলে তাঁর নামও বড় বড় করে লেখা হয়। তবে নেতার দেওয়া এই সাহায্য বা অনুদান তাঁর পকেট থেকে অবশ্যই যায় না। জনসাধারণেরই অর্থের যে সরকারি টাকা তিনি এলাকা উন্নয়নের জন্য পান তার থেকেই তিনি পান। সঙ্গে পেয়ে যান নিজের প্রচারটিও।

এবং পূর্বোক্ত ঐ আধিকারিকের কথা থেকেই স্পষ্ট, একবার অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে রাস্তায় কোনও গাড়ি নেমে পড়ার পর তার ওপর নূন্যতম সরকারি নজরদারির ব্যবস্থা নেই, থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বল এবং বর্তমান পরিকাঠামোয় তা সম্ভবও নয়। বিভিন্ন ক্লাব বা সংগঠন যে অ্যাম্বুলেন্স চালান, সেগুলি তাদের সদিচ্ছার উপরই তা চলে। তার ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃতও হন। বিপদে আপদে তা ভাড়া পাওয়া যায়, সাধারণ ট্যাক্সির চেয়ে তা তাড়াতাড়ি পথ করে নিতে পারে (অবশ্যই ভেতরে রোগি থাকতে হবে), অন্তত অক্সিজেনটুকু পাওয়ার মানসিক স্বস্তিও পাওয়া যায়। তবে অন্যদিকে এটিও ঠিক, কোনও কোনও সংস্থার কাছে অ্যাম্বুলেন্স উচ্চহারে ভাড়া দেওয়াটা নিজেদের সেবামূলক কাজের মোড়কে অর্থোপার্জনেরই বড় উপায় হয়ে দাঁড়ায়।

সব মিলিয়ে মনে হয় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ক্ষেত্রে কিছু কিছু দিকে নজর দেওয়া দরকার যেমন—

৯১) অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেনের পাশাপাশি জীবনদায়ী কিছু ওষুধপত্র এবং তা ব্যবহারের জন্য ইনজেকশন সেট ইত্যাদি থাকা দরকার।

(২) অ্যাম্বুলেন্সে রোগির সঙ্গে একজন চিকিৎসক এবং আরো ভাল হয় সঙ্গে প্রশিক্ষিত নার্স থাকা দরকার। অনেক প্রাইভেট হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সে চিকিৎসক রাখা হয়। কখনো কখনো রোগির বাড়ির লোক নিজের উদ্যোগে একজন চিকিৎসককে সঙ্গে রাখেন। কিন্তু ব্যাপারটি আবশ্যিক করা দরকার। এটি প্রয়োজনে রোগির তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া কখনো কখনো অ্যাম্বুলেন্সে যেতে যেতেই রোগির মৃত্যু ঘটতে পারে। তখন ঐ রোগিকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে নিয়ম অনুযায়ী পুলিশ কেস, পোস্ট মর্টেম (কাটাছেঁড়া) করতে হয়। অথবা ফিরিয়ে এনে কোনও ডাক্তারকে দেখিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট নিতে হয়। তিনি মৃত্যুর সময় রোগি না দেখলেও প্রায়শই চড়া ফি নিয়ে তা করে দেন। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগিকে রোগিকে রেফার করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সময় রোগির মৃত্যু ঘটলে তবু ঐ হাসপাতালে ফিরিয়ে এনে ডেথ সার্টিফিকেট নেওয়া যায়। না হলে রোগির বাড়ির লোকেরা বেশ বিপদেই পড়েন। সে ক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্সে রোগির সঙ্গে চিকিৎসক থাকলে ডেথ সার্টিফিকেট পেতে অসুবিধে হয় না।

(৩) আমাদের মত দেশে প্রবল গ্রীষ্মে অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও ধূলিমুক্ত রাখার ব্যবস্থা থাকাও দরকার।

সর্বোপরি দরকার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে ব্যবসায়িক চরিত্র থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণভাবে মানবিকভাবে দেখা। আর এর জন্য জনস্বার্থে সরকারি সাহায্য ও নজরদারির ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন।

উ মা

সেতারের 'জোয়ারি': একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সিদ্ধার্থ রায়

সেতার আমাদের দেশের একটি বহুল প্রচারিত লোকপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রটির একটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য। আলোচনার প্রথমেই দুটি প্রাথমিক তথ্যের উল্লেখ করি:

(১) প্রত্যেক স্বরধ্বনির তিনটি ধর্ম আছে— ক) প্রাবল্য অর্থাৎ ধ্বনিটি কতটা জোরালো, খ) তীক্ষ্ণতা, ধ্বনিটি কতটা চড়া বা খাদ, আর গ) প্রকৃতি। যে ধর্মটির জন্য আমরা ধ্বনিটির উৎসের ধারণা পাই— সেটি ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠনির্গত না কোনো যন্ত্রবিশেষ-উদ্ভূত।

(২) তারযন্ত্রনিঃসৃত ধ্বনির ক্ষেত্রে, একটি টান-টান করে বাঁধা তার থেকে তিনরকমভাবে ধ্বনি উৎপাদন করা সম্ভব: (ক) ছড়ি টেনে, যেমন বেহালা, এসরাজ বা সারেঙ্গীতে। (খ) ঘা দিয়ে, যেমন পিয়ানো ও সন্তুরে। (গ) টংকার বা টোকা দিয়ে, যেমন সেতার, সরোদ, বীণা (দক্ষিণ ভারতে বহুল প্রচলিত), তানপুরা, গিটার, ম্যান্ডোলিন ইত্যাদিতে।

একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ধ্বনি-উৎপাদনের প্রক্রিয়া একরকম হলেই ধ্বনির প্রকৃতি মোটেই হুবহু একরকম হয় না; পিয়ানো ও সন্তুরের ধ্বনির সাদৃশ্যের চাইতে বৈসাদৃশ্যই প্রকট, বেহালা ও এসরাজের ধ্বনির আপাতসাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়।

টোকা-দেওয়া যন্ত্রগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়—এদের মধ্যে সরোদ, গিটার, ম্যান্ডোলিন—এগুলির সওয়ারী তীক্ষ্ম শীর্ষ।

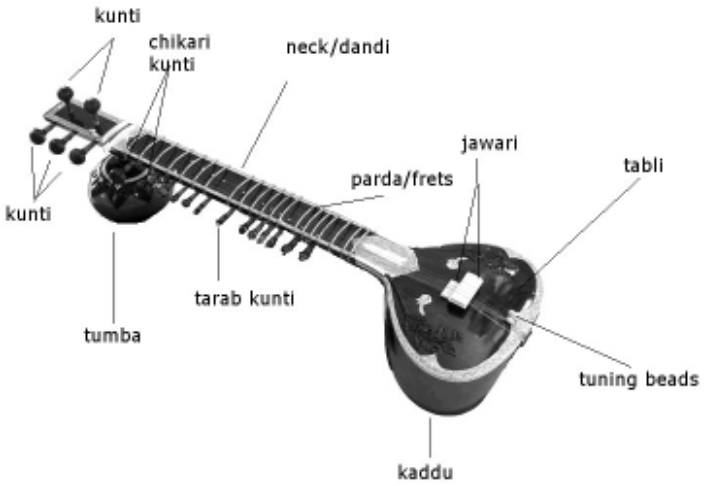

আর সেতার, বীণা ও তানপুরার সওয়ারীর শীর্ষদেশ আয়তাকার। পাশ্চাত্যের কোনো বাদ্যযন্ত্রে আয়তশীর্ষ সওয়ারী দেখা যায় না।

এবারে সেতারের কথায় আসি। সেতারের সওয়ারীর মাথায় বসানো থাকে হরিণের শিঙের অথবা ফাইবার গ্লাসের একটি আয়তাকার টুকরো। কাজেই, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে তারের একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য এই টুকরোটিকে বেশ চেপে ছুঁয়ে আছে। বাস্তবে কিন্তু মোটেই তা হয় না—কারণ শিঙের টুকরোটি সমতল নয়, তার প্রস্থ-বরাবর সেটিকে অতি সূক্ষ্ম ও মসৃণ একটি বক্রতা দেওয়া থাকে। কাজেই একটি তার সওয়ারীকে স্পর্শ করার পর সেটির কিছু অংশ টুকরোটিকে ছুঁয়ে থাকলেও বাকী অংশ টুকরোটির একচুল উপর দিয়ে চলে যায়। সেতারের পর্দায়— এমনকি ডান্ডীর নীচের দিকের চড়া সুরের পর্দায়— টিপ দিলেও তারটির কিছু অংশ সওয়ারীকে স্পর্শ করে না। সওয়ারীর আয়তপৃষ্ঠের এই বিশেষ অবস্থাকেই সেতার (বা বীণা বা তানপুরার) 'জোয়ারি' বলা হয়।

নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি ভি রামন ভারতের একান্ত নিজস্ব 'জোয়ারিদার' বাদ্যযন্ত্র সেতার, বীণা ও তানপুরার স্বরধ্বনির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে, সেতারের তারে টোকা দিলে তারটির সওয়ারী-স্পর্শ-না-করা অংশ সওয়ারীকে ঘা দিতে থাকে। উলটে বললে, তারটি পুনঃ পুনঃ সওয়ারীর আঘাত পেতে থাকে। সেইজন্য, সব মিলিয়ে যে ধ্বনিটি পাওয়া যায় তাতে টংকার-উদ্ভূত ধ্বনির প্রকৃতির সঙ্গে আঘাত-উদ্ভূত ধ্বনির প্রকৃতিও মিশে যায়। মিশ্র ধ্বনিটিতে এই দুই প্রকৃতির ধ্বনি কী অনুপাতে থাকবে সেটা নির্ভর করে তারের কতটা দৈর্ঘ্য সওয়ারীর ফলকটিকে ছুঁয়ে থাকবে আর কতটাই বা তাকে ছুঁয়ে তার একচুল উপর দিয়ে যাবে, তার অনুপাতের উপর। প্রথম অংশটি অপেক্ষাকৃত বড় হলে সেতারের আওয়াজ হয় 'চাপা' ধরনের, আর দ্বিতীয়টি যত বড় হবে, আওয়াজ হবে তত বেশি 'খোলা' বা 'ঝরঝরে'। অত্যন্ত দক্ষ এবং নান্দনিকবোধসম্পন্ন কারিগরই সেতারের শ্রুতিনন্দন জোয়ারি করতে পারেন।

বীণার জোয়ারি সম্বন্ধেও একই রকম বিশ্লেষণ প্রযোজ্য। তানপুরা যন্ত্রটিতে শুধু খোলা তার বাজতে থাকে; সেক্ষেত্রে শিল্পী নিজেই জোয়ারি ঠিক করে নেন--- তারগুলির নীচে একটি করে সুতো গলিয়ে দিয়ে। সুতোগুলি সওয়ারীর উপরে একটু টেনে টেনে ঠিক ঠিক জায়গায় আনতে পারলেই তানপুরার তারগুলি একে একে 'জোয়ারিদার' চেরা চেরা আওয়াজ দিতে থাকে।

করুণাময় গোস্বামী প্রণীত 'সঙ্গীতকোষ'-এ জোয়ারি সম্পর্কে বলা হয়েছে— সাঙ্গীতিক ধ্বনির এক প্রকার বৈশিষ্ট্যের নাম। ততযন্ত্রের লাউ-এর ওপর কাষ্ঠ, ধাতু বা হাড়দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্রাকার আসনের মত একটি সওয়ারী সন্নিবেশিত থাকে। তারগুলো এর ওপর দিয়ে নিম্ন মেরুতে সংযুক্ত হয়। তারগুলো সওয়ারীতে এমনভাবে সন্নিবেশিত হয় যে তা থেকে কম্পনজনিত ধ্বনি নির্গত হয়। এই কম্পনের ফলে তন্ত্রী থেকে উত্থিত স্বর অনুরণন যুক্ত হয় এবং শুনতে ভাল শোনায়। একে বলা হয় জোয়ারী। উৎকৃষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনির সর্বোচ্চ পরিশীলিত রূপ এই অর্থেও বর্তমান কালে জোয়ারী কথাটি ব্যবহৃত হয়। শুধু তা বাদ্যে নয়, কণ্ঠের ক্ষেত্রেও জোয়ারী কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মধুর অনুরণন যুক্ত কণ্ঠস্বরকে জোয়ারী যুক্ত কণ্ঠস্বর বলা হয়। দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে কণ্ঠে জোয়ারী গুণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। সওয়ারী থেকেই জোয়ারী কথাটি এসে থাকবে।

উ মা

বইমেলায় আমাদের স্টল নং
১১১

মানুষ গড়ার কাজে ওড়িশার বাজিরাউত ছাত্রাবাস

মাত্র বারো বছরের ছেলে বাজিরাউত। এই বয়সেই বুঝে ফেলেছে তার জন্মভূমিকে পরাধীন রাখতে যারা সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে তাদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা নয়। জনা কয়েক ব্রিটিশ সৈন্য তার নৌকোয় ব্রাহ্মণী নদী পার করে দিতে বলে। রাজিরাউত বেঁকে দাঁড়ায়। কালা আদমির এই ঔদ্ধত্যের জন্য তারা সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনটাই কেড়ে নেয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কারক, ভূতপূর্ব গণপরিষদের (Constituent Assembly) সদস্যা মালতী চৌধুরি এবং গান্ধীবাদে অনুপ্রাণিত ও প্রাজ্ঞ, ওড়িশার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরি কিশোর বাজিরাউত জীবন দিয়ে যে শিক্ষাটি রেখে গেল তা সযত্নে তুলে ধরলেন। যে কোনো সৃষ্টির মূলে থাকে ত্যাগ, যার চরম প্রতিমূর্তি হল বাজিরাউত। তাকে সামনে রেখে ১১ মে, ১৯৪৬ সালে তৈরি বাজিরাউত ছাত্রাবাস।

স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত প্রজামণ্ডল আন্দোলনে যে সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী অংশগ্রহণ করেছিলেন মূলত তাঁদের সন্তানাদির আবাসন ও শিক্ষার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশে এই ছাত্রাবাস কাজ শুরু করে। সময়ের সঙ্গে বাস্তব চাহিদার উপর নির্ভর করে বর্তমানে ওড়িশার যে কোনো অঞ্চলের তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং সকল অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এই ছাত্রাবাসের দ্বার উন্মুক্ত। ছাত্রাবাসের সীমানা সংলগ্ন এলাকায় তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে 'উৎকল নবজীবন মণ্ডল' নামে একটি সংগঠন কাজ করছে। এই সংগঠন বাজিরাউত ছাত্রাবাসে ছাত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মালতী ও নবকৃষ্ণ এবং তাঁদের সহযোগীবৃন্দ নৈতালিম নামে একটি সৃজনশীল শিক্ষাদর্শকে বাজিরাউত ছাত্রাবাসে বাস্তর রূপ দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই শিক্ষাদর্শের মূল কথা হল প্রকৃতির কোলে বসে প্রকৃতির সকল উপাদান সহযোগে সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ ঘটানো। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আক্ষরিক শিক্ষার সঙ্গে কৃষি, শিল্প, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, প্রকৃতিবন্দনা শিক্ষার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পরিচালক মণ্ডলী আত্মকেন্দ্রিক গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিকূলে সমাজমুখীন শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশে হাল ধরেছেন।

ব্যবস্থাপনা

বাজিরাউত ছাত্রাবাস ব্যবস্থাপনায় দু'ধরনের সদস্য আছেন। বাৎসরিক সদস্যপদ পুনর্নবীকরণকারী সদস্য, এ ছাড়া আছেন আজীবন সদস্য। সদস্যগণের মধ্য থেকে পনের জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহক কমিটি তৈরি হয়। কার্যনির্বাহক কমিটির কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর। পদাধিকারীরা হলেন সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। বর্তমান সময়ে শ্রীমতি কৃষ্ণা মহান্তি - সভাপতি, অধ্যাপক বিভূতিভূষণ মহান্তি - কার্যকরী সভাপতি ও সম্পাদক, এবং শ্রী শিবরাম মিশ্র - কোষাধ্যক্ষ।

সমগোত্রীয় সংগঠনের সাথে যোগাযোগ

রাজিরাউত ছাত্রাবাস নয়াদিল্লীর ভারতীয় বয়স্ক শিক্ষা সংগঠনের সদস্য। ইহা অঙ্গুলের জনশিক্ষা সংস্থানের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে কাজ করে থাকে। ছাত্রাবাসের সভাপতি কৃষ্ণা মহান্তি অঙ্গুল জনশিক্ষা সংস্থানের ভাইস চেয়ারম্যান।

বাজিরাউত ছাত্রাবাসের দৈনন্দিন ও বাৎসরিক কর্মসূচি

১. প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় অন্তধর্মীয় প্রার্থনা; ২. প্রাতঃকালীন যোগাভ্যাস; ৩. বাগান পরিচর্যা ও কৃষিকাজ; ৪. গণ সাফাই; ৫. গণ রান্না; ৬. অধ্যায়ন; ৭. খেলাধূলা;৮. সুতো কাটা; ৯. জনশিক্ষা সংস্থানের সহযোগিতায় হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ; ১০. উৎসব পর্বাদি উদ্‌যাপন; ১১. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও মনীষীদের জন্মদিবস উদ্‌যাপন; ১২. সঙ্গীত ও নৃত্যকলাযোগে বিভিন্ন ঋতুবন্দনা; ১৩. প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ঘটনার মোকাবিলায় স্বেচ্ছা পরিষেবায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ।

ছাত্রাবাসের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে ছাত্রাবাসের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৭৫। আগে এলাকার চার/পাঁচটা স্কুলে ছাত্রাবাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য পাঠাতে হত। বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাতে হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা আশানুরূপ গড়ে ওঠে নি। এই অসুবিধা কাটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা হিসাবে ছাত্রাবাস সীমানার মধ্যেই ছাত্রাবাসের নিজস্ব একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা সপ্তম মান পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পায়। ভবিষ্যতে ছাত্রাবাস ক্যাম্পাসেই মাধ্যমিক ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা উন্নীত করার পরিকল্পনা

আছে। ছাত্রাবাসের জন্য সারাজীবনের উৎসর্গীকৃত প্রাণ বালভদ্র মিশ্রের নামে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বালভদ্র বিদ্যামন্দির নামে গড়ে তোলা হয়েছে।

এই ১৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ওড়িশা সরকার অনুদান মঞ্জুর করে থাকে। এই অনুদান থেকে কোনরকমে খাদ্য ও জামাকাপড়ের ব্যয় নির্বাহ করা যায়। প্রকৃত অর্থে তাদের সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোনো অর্থ খরচ করা সম্ভব হয় না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যতই শিক্ষার অধিকার নিয়ে বাগাড়ম্বর করা হোক না কেন তা কেবল বাতাসেই মিলিয়ে যায়।

বাজিরাউত ছাত্রাবাসের এলাকা প্রায় ১০ একর। তার মধ্যে ৪.৫ একর জমি চাষবাসের জন্য, ১.৫ একরের একটি পুকুর আছে। শিক্ষার কায়িক অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীরা জমিতে চাষবাস করে, তা থেকে যে তরিতরকারি উৎপন্ন হয় তা তারাই ভোগ করে। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে গোপালন, মৎস্য চাষ এবং মুরগি খামারের কাজে হাত দেয়া যাচ্ছে না।

আপনি কীভাবে সাহায্য করতে পারেন

বাজিরাউত ছাত্রাবাস যে কোনো আর্থিক সাহায্যকে স্বাগত জানায়। আপনি ছাত্রাবাসের যে কোনো ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন। ক্ষেত্রগুলি হল,— ক্যাম্পাসের প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুষম খাদ্য ও স্বাস্থ্য, কৃষিকাজ, দুগ্ধ উৎপাদন, মৎস্য চাষ, মুরগি খামার, মাশরুম চাষ, ডর্মিটরিজের মেরামতি কাজ, শান্তি মন্দির (প্রার্থনা তথা খাবার ঘর), শিশু উদ্যান তৈরি (children park), গ্রন্থাগার ও পাঠভবনের উন্নতি সাধন।

আপনি আপনার সাহায্য চেকে বা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অঙ্গুল শাখায় প্রদানযোগ্য (Payable) ডিমান্ড ড্রাফটে পাঠাতে পারেন।

পাঠাবার ঠিকানা—
সম্পাদক,
বাজিরাউত ছাত্রাবাস
অঙ্গুল (ANGUL) - ৭৫৯১২২
ওড়িশা, ভারত

ভাবানুবাদ - **নিরঞ্জন বিশ্বাস**

প্রতিবাদের আরেক নাম শর্মিলা চানু

পূরবী ঘোষ

২০১০ সালের ৪ঠা নভেম্বর আইরম শর্মিলা চানুর অনশন আন্দোলনের ১০ বছর পূর্ণ হল। কে এই শর্মিলা, কেনই বা ১০ বছর ধরে চলছে তার অনশন। উত্তরটা অনেকেরই অজানা। কারণ, শর্মিলা পশ্চিমবাংলার মেয়ে নয়। প্রতিবেশী রাজ্য মনিপুরের এক মহিলা কবি। ইম্ফলের এক পশু হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর একেবারে নিরক্ষর বাবার চতুর্থ সন্তান শর্মিলা। মূলত দাদা সিংহজিতের চেষ্টায় এবং তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে ওঠা এই মেয়েটি ছোট থেকেই আর পাঁচজনের থেকে কিছুটা আলাদা স্বভাবের। শান্ত এবং শান্তিপ্রিয় মেয়েটি ছোট থেকে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। দাদার প্রভাবেই তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সমাজ সচেতনতা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম।

ভারত সরকার দেশের তথাকথিত নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীর 'বিশেষ নিরাপত্তা আইন (AFPSA) ১৯৫৮' ১৯৮০ সাল থেকে মনিপুরে প্রয়োগ করে। কারণ মনিপুর 'উপদ্রুত' এলাকা। তাই এই এলাকায় সেনাবাহিনীর হাতে এই বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই ক্ষমতার বলে সেনাবাহিনী যখন-তখন যাকে-তাকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করতে পারে, গুলি করে হত্যা করতে পারে, যার তার বাড়ি লুঠ করতে পারে এমন কি মেয়েদের ধর্ষণও করতে পারে!

এই আইনের প্রতিবাদে সেই সময় মনিপুর উত্তাল হয়ে উঠেছিল এবং অনেক মিছিল মিটিংও হয়েছিল। কিন্তু সরকার তো সরকারই। জনগণের সভা, মিছিল ইত্যাদিতে গুরুত্ব দিলে তো সরকার চালানোই যাবে না! তাই প্রতিবাদ আন্দোলন সত্ত্বেও আইনটি মনিপুরে বহাল রইল। আর গোটা মনিপুরে বেড়ে চলল সেনাবাহিনীর লাগামহীন লুঠতরাজ, খুন, ধর্ষণ। সব মিলিয়ে মনিপুর সত্যি সত্যিই এতদিনে উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হল!

এই সব দেখতে দেখতেই বড় হয়ে উঠল শর্মিলা এবং সরকারের এই জঘন্য আইনের বিরুদ্ধে তার মন প্রতিবাদী হয়ে উঠল। কিন্তু শান্ত স্বভাবের এই মেয়েটি সরকারি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হলেও, প্রতিবাদে মুখর হল না। তার মনে অনেক প্রশ্নের ঝড় উঠলেও সে কিন্তু তার প্রকাশ সীমাবদ্ধ রাখল লেখালেখি ও আলাপ আলোচনার মধ্যে। তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তার জন্মভূমি মনিপুর ভারতের অন্যতম একটি অঙ্গরাজ্য হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় সঙ্গীতে পঞ্জাব, সিন্ধু, উৎকল, দ্রাবিড় ও বঙ্গদেশের পাশে জায়গা পেল না কেন? কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেন মনিপুরকে 'উপদ্রুত' ঘোষণা করা হল? কেন যখন তখন সেনাবাহিনীর অত্যাচার নামিয়ে আনা হচ্ছে শহরের বুকে? এই সব প্রশ্ন সে তুলেছে তার কবিতায়, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে। প্রকাশ্যে ঝড় তোলে নি।

কিন্তু ২০০০ সালের ২রা নভেম্বর মনিপুরে মালোম শহরে বাস স্ট্যান্ডে সেনাবাহিনী হত্যা করল ১০ জন নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে। যারা কোনও দোষ করে নি। ওরা অপেক্ষা করছিল বাস ধরার জন্য। ঐ দিন শর্মিলা মালোমের একটি বাড়িতে শান্তি মিটিঙের আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। পরের দিন সকালে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এই দশজনের হত্যার খবর তাকে আর শান্ত রাখতে পারল না। প্রতিবাদের ঝড় এইবার সে তুলল প্রকাশ্যে। প্রথমে অবিলম্বে এই কুৎসিত আইন 'AFSPA' তোলার আবেদন জানিয়ে সরকারের কাছে প্রথামাফিক আবেদন করল। সরকারি তরফে কোনো ব্যবস্থা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শর্মিলা সিদ্ধান্ত নিল অনশনের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ শুরু করার। সেই অনশন চলছে আজও। যখন সে অনশন শুরু করে, তখন তার বয়স ছিল '২৪' আজ সে '৩৪'। ২০০৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর থেকে আইরম শর্মিলা চানু শুরু করে আমরণ অনশন। তহেলকা পত্রিকায় সে লিখেছিল—

'I was shocked by the dead bodies of Malom, on the front page. I was on my way to a peace rally. But I realised there was no means to stop further violations by the armed forces. So I decided to fast.

- From TEHELKA MAGAZINE Vol-VI issue-48. Dated-December-05, 2009.

"মালোমের ঘটনায় আমি মর্মাহত। আমি আমার পদ্ধতিতে শান্তি মিছিল করি। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারি, সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস এতে বন্ধ হবে না। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই অনশনের।"

২০০৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর থেকে অনশন শুরু করার কয়েকদিন পরে আত্মহত্যার চেষ্টা করার অপরাধে পুলিশ আইরম-কে গ্রেপ্তার করে। এবং ইম্ফলের জে এন হাসপাতালে ভর্তি করে নাকের ভিতর নল ঢুকিয়ে তাকে খাওয়ানো হয়। এইভাবেই গত দশ বছর ধরে নলের সাহায্যে খাবার ঢুকিয়ে শর্মিলাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। মজার কথা হল বছরের বিশেষ কয়েকটি দিন, যেমন আন্তর্জাতিক নারীদিবস, ১৫ই আগস্ট আর ২৬শে জানুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, আর পরের দিনই আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এইভাবে চলছে গত দশটি বছর। দিনে দিনে শর্মিলা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। এখন আর সে উঠে বসতে পারে না, ভাল করে কথাও বলতে পারে না। কিন্তু সে অটুট রেখেছে মনোবল। তার সমস্ত চিন্তা ও চেতনা এখনও যথেষ্ট সক্রিয়। তার দাবি থেকে সে একচুল-ও সরে নি।

আইরম শর্মিলা চানু-র এই প্রতিবাদী আন্দোলন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই আন্দোলনের খবর বা আন্দোলনকারীর নাম পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষেরই অজানা। কারণ কলকাতার নামী অনামী কোনও দৈনিক কাগজেই এই আন্দোলন সম্পর্কে কিছু ছাপা হয় না। বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলোও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

গত ৪ঠা নভেম্বর ২০১০-এ শর্মিলার অনশনের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবাংলার মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাটো অনুষ্ঠান করে শর্মিলার প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছে। যেমন-৩রা নভেম্বর ধর্মতলায় 'মন্থন' পত্রিকা ও অন্যান্য আরও কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে ১২ ঘণ্টার অনশন ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, ৪ঠা নভেম্বর বালী এ পি ডি আর-এর উদ্যোগেও ঐ একই অনুষ্ঠান করে সংহতি জানানো হয়েছে।

শর্মিলা প্রতিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন পথের দিশারী। তাই গোটা ভারতে শুধু নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শর্মিলার এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের খবর পৌঁছানো দরকার। এ দায়িত্ব নিতে হবে পত্র-পত্রিকা ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিকে। তার দাবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদেরও বলতে হবে ব্রিটিশদের তৈরি এই জঘন্যতম আইন অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হোক।

সূত্র: দ্য সাংহাই এক্সপ্রেস

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ২৫ বছর

পূরবী ঘোষ ও অরুণ পাল

দেখতে দেখতে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' (এন বি এ) ২৫ বছর অতিক্রম করল। ভারতের গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এই আন্দোলন এক নজিরবিহীন ঘটনা। এই ঘটনায় দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এক— আন্দোলনকারীদের আপোসহীন সংগ্রামী মনোভাব ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা। দুই— কর্ণপাতহীন, অনমনীয় সরকারি ঔদাসীন্য। গত ২৫ বছরে ভারত সরকারের নানান উত্থান-পতন, দলবদল ঘটেছে। কিন্তু নর্মদা বাঁধের বিষয়ে সরকারি মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তাই আন্দোলনকারীরাও দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে একটানা চালিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলন।

জানি না, আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়িত্ব, নাকি আন্দোলনকারীদের দৃঢ় মনোবল, কিসের টানে এত মানুষ সামিল হয়েছেন। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নর্মদার দু-পাশে এমন কোনো গ্রাম নেই, আদিবাসী জনগোষ্ঠী নেই, যাদের কাছে এই আন্দোলনের খবর পৌঁছয়নি। গ্রামের কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে শহরের সচ্ছল পরিবারের শিক্ষিত যুবক যুবতীরাও এসে দাঁড়িয়েছেন এই আন্দোলনের পাশে। নর্মদার গতিপথের মধ্যে পড়া রাজ্যগুলো তো বটেই, এছাড়াও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষ এমন কি সুদূর ক্যালিফোর্ণিয়ার যুবক মাইক, ইংল্যান্ডের তরুণ ডেভিডের মত ছেলেরাও নিজেদের লেখাপড়া, জীবিকা ছেড়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এইভাবেই 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' পেয়ে গেছে আন্তর্জাতিক চরিত্র।

এই 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে'র রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার একটা সুযোগ এসে যাওয়ায় সর্বভারতীয় চরিত্রের একটি আন্দোলনের কার্য পদ্ধতিকে খুব কাছ থেকে দেখলাম, বুঝলাম। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব মেধা পাটেকরের আমন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ২২শে অক্টোবর ২০২১০-এ আমরা পৌঁছই সাতপুরা পাহাড় পেরিয়ে নর্মদার তীরে 'ধাদগাঁও'-এ। সেখানে প্রথমদিনের কর্মসূচি ছিল জনসভা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজনদের রেলওয়ে স্টেশন থেকে গাড়িতে সভাস্থলে পৌঁছনোর ব্যবস্থা ছিল।

২২ তারিখ ভোরে মানমাদ স্টেশনে পৌঁছনোর পর আমরাও স্টেশনেরই এক ফুড স্টলের মালিকের (যিনি এন বি এ-র সক্রিয় কর্মী) দ্বারা চা-জলখাবারে আপ্যায়িত হয়ে, গাড়ি করে ৫ ঘণ্টা চলার পরে গিয়ে নামলাম ধাদগাঁও-এ। সভা শুরুর আগে এলাকায় একটা ছোট মিছিল করে বাজারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সভাস্থলে পৌঁছলাম। নানা ধরনের পোস্টার, ফেস্টুন, অপটু হাতের লেখায় রংবেরঙের পোস্টার, পতাকা ইত্যাদি দিয়ে সাজানো সভাস্থলে দেখা গেল এই আন্দোলনের মধ্যমণি মেধাজিকে। ছিপছিপে

চেহারার মানুষটি একেবারে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কখন-ও দেখলাম বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করছেন, তারপরেই মঞ্চে উঠে সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট জনেদের সঙ্গে সকলের পরিচয় করাচ্ছেন, তারপরেই সংবাদ মাধ্যমের লোকেদের সঙ্গে কথা বলছেন। বক্তব্য, গান, আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বেলা গড়িয়ে সভা শেষ হতে হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। তারপর ২০ মিনিট উতরাই পথে হেঁটে আমরা পৌঁছলাম নদীর ঘাটে। যেখানে আগে থেকেই করে রাখা ব্যবস্থা অনুযায়ী মৎস্যজীবীদের নৌকো বাঁধা ছিল। এই মৎস্যজীবীরা সকলেই আন্দোলনকারী। কারণ নর্মদায় বাঁধ দেওয়ার ফলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রায় ৪ ঘণ্টার নৌকো যাত্রার পর আমরা পৌঁছলাম রাত্রিবাসের জায়গায়। নৌকো থেকে নেমে কিছুটা চড়াই পথ পেরিয়ে উঠে পড়লাম প্রায় কয়েকশ ফুট ওপরে, বেশ কিছুটা সমতল জায়গায়। সেখানে খোলা আকাশের নিচে পলিথিন বিছিয়ে গরম ভাত আর ডাল খেয়ে, ওইখানেই ঘুমিয়ে কেটে গেল রাত। ভোরে উঠে ধ্যান, 'নর্মদামায়ীকে' নিয়ে বাঁধা গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শুরু হল দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী 'ভাদল' গ্রামে হল আমাদের এই প্রভাতী অনুষ্ঠান। স্থানীয় মানুষরা জানালেন নাম মাত্র মূল্যে তাদের অঞ্চলের সমস্ত গাছ কেটে নেওয়ার ঘটনা। যেহেতু নদীর ধারের সব গাছ কেটে নিলে বর্ষায় সমস্ত অঞ্চলটা ডুবে যাবে, তাই গ্রামবাসীরা বাধা দিতে এসে কিভাবে পুলিশের নির্মম লাঠি পেটা খেয়েছে তার বিবরণ দিলেন স্থানীয় একজন সংগঠক। স্বামী অগ্নিবেশ লড়াই জারি রাখার আহ্বান রাখলেন। এই করতে করতে বেলা ৯টা বাজল। আবার আমাদের চলা শুরু হল। ট্রাকে করে পাহাড়ি পথে অনেকটা পথ আসার পর ছোট্ট একটি জনপদে এসে থামল আমাদের যাত্রা। এলাকার প্রতিটি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা রুটি, পুরি আর আচার সহযোগে সারা হল আমাদের দুপুরের খাওয়া। তারপর আবার ট্রাকে চলা। এবার আমাদের লক্ষ্যস্থল 'বারাউনি' শহর। সেখানে এন এইচ পি এম অর্থাৎ ন্যাশনাল এলায়েন্স ফর পিপল মুভমেন্টের অষ্টম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের মধ্য দিয়েই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল।

এ তো গেল আন্দোলনের রজত-জয়ন্তী বর্ষ পালনের অনুষ্ঠানের বর্ণনা। প্রসঙ্গত নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যাক। নর্মদা নদীটি মধ্যপ্রদেশের অমর কণ্টক পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে গুজরাত সংলগ্ন খাম্বাত্ উপসাগরে পতিত হয়েছে। এই নদী ও তার দু-পাশের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেমে আসা অসংখ্য ছোট ছোট শাখানদী নিয়ে গঠিত সমগ্র অঞ্চলটি নর্মদা উপত্যকা নামে পরিচিত। মূল নদী ও শাখানদীর ওপর ছোট বড় মিলিয়ে ৩০টি বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৬টি বাঁধ তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি আপার নর্মদায় এবং আরও যে সাতটি বাঁধ নির্মিত হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে সর্দার সরোবর, ইন্দিরা সরোবর ও মহেশ্বর। এই তিনটি বাঁধ নদীর নিম্ন প্রবাহে অবস্থিত। এই বাঁধগুলির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ও বিতর্কিত সর্দার সরোবরের প্রস্তাবিত ১৩৮.৬৮ মিটারের মধ্যে ১২২.৯২ মিটার তৈরি হয়ে গেছে। মোহনার কাছাকাছি অবস্থিত এই বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ৫১হাজার। যারা এখনও পর্যন্ত কোনও পুনর্বাসন পান নি। ২০০০ আদিবাসী পরিবার যাদের জমি ইতিমধ্যেই জলের তলায় চলে গেছে, তাঁরাও এখনও কোনও জমি পাননি। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা গুজরাতে ১৯, মহারাষ্ট্রে ৩২ এবং মধ্যপ্রদেশে ১৭৭। মোট ২২৮।

সর্দার সরোবর প্রকল্পের জন্য শুরুতে ধার্য করা হয়েছিল ৪ হাজার ২শো কোটি টাকা। বর্তমানে পঞ্চদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার কোটি, ভবিষ্যতে ৭০ কোটি ছাপিয়ে যাবে বলে অনুমান। ১৯৮৫ সালের মে মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক সর্দার সরোবর প্রকল্পের জন্য ৪৫ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদন করে। ওই বছরেই মেধা পাটেকর ও বসুধা দিগম্বর মহারাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলো ঘুরতে থাকেন। ১৯৮৬ সালে ফেব্রুয়ারিতে তৈরি হয় 'নর্মদা ধরঙগ্রস্ত সমিতি'। ১৯৮৭ সালে পরিবেশ মন্ত্রক এবং প্ল্যানিং কমিশন ছাড়পত্র দেওয়ার পর অক্টোবরে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ২১শে অক্টোবর গুজরাতের 'কেবাদিয়াতে' বিশাল জমায়েত হয়। ১৯৮৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বাঁধ এলাকায় জমায়েত হয় ১০ হাজার লোকের। সেপ্টেম্বরে ২৫০টি সংগঠনের উদ্যোগে নর্মদা উপত্যকার মধ্যপ্রদেশের হর্ষদে ৫০ হাজার মানুষের জমায়েতে শ্লোগান ওঠে 'বিনাশ নয়, বিকাশ চাই।'

এরপর গত ২০ বছর ধরে আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে। মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে, বিস্তৃতি লাভ করেছে, কিন্তু বাঁধের উচ্চতা কমানো যায় নি। সরকারি তরফে বাঁধের উচ্চতা না কমালেও 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন'কে কিন্তু দমানো যায় নি। এ আন্দোলন চলছে এবং চলবে, যতদিন না ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো, তাদের পরিবারগুলো ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পাচ্ছে। এই আন্দোলনের সাফল্য ও সার্থকতা এটাই যে এই আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় না থেকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়ে বিকল্প উন্নয়নের প্রশ্নটাকে সামনে তুলে ধরেছে। এবং ভারতের সমস্ত সামাজিক ও গণআন্দোলনকে ধ্রুবতারার মত পথ দেখাচ্ছে। **উ মা**

জনস্বার্থে, জনগণের বিশেষ অবগতির জন্য এ প্রচেষ্টা

কলকাতার অনেক নার্সিংহোম ও হাসপাতালেই আই সি সি ইউ-তে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাক্টেরিয়া পুষে রাখা হয় ঠিকমতো বিশুদ্ধিকরণ, ফিউমিগেশান, নির্বিজানুকরণ না করে। ফলত আই সি সি ইউ-তে ভর্তি থাকা রুগিদের ইনফেকশন এবং তার থেকে সেপ্টিসেমিয়া হয়। সেই সেপ্টিসেমিয়া-র চিকিৎসা করার অজুহাতে অত্যন্ত দামি অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এই নার্সিংহোম, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ডাক্তারবাবুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিক পক্ষের সাথে শত্রুতা হয়ে যাবে এই ভয়ে সব জেনেও একদম চুপ করে থাকেন। লক্ষ লক্ষ টাকার অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করার এই চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য সরল, সাধারণ মানুষগুলোর গলা কেটে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা। সেপ্টিসেমিয়া-তে আক্রান্ত প্রায় সমস্ত রুগিই মারা যান। তার কারণ দুটো। (১) সেপ্টিসেমিয়া স্বয়ং, (২) অতীব মূল্যবান, অতীব ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিকস্ দীর্ঘদিন ফোর রুট-এ (রক্তের মধ্যে ডাইরেক্টলি) চালানোর জন্য। এতে মালিকদের লাভ হয় তিনভাবে। ১) প্রচুর মুনাফা অর্জন এই অত্যন্ত দামি অ্যান্টিবায়োটিকস্ বিক্রির মাধ্যমে, ২) মরণাপন্ন রুগিদের আই সি সি ইউ-তে বেশি সময় (দিন) রেখে বিল চরচর করে বাড়ানো, ৩) ভেন্টিলেটর-এ বেশিদিন রুগিকে চাপিয়ে রাখার সুযোগ এবং তার মাধ্যমে বিশাল বিল তৈরি করা। এটাতো অতীব স্পষ্ট জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ। এই কথা স্পষ্ট যে নার্সিং হোমগুলোর মালিকপক্ষই এই ঘৃণ্য কাজের জন্য দায়ী। জনস্বাস্থ্য সাধিকার মঞ্চর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ডি পি মল্লিক এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলায় উদ্যোগ নিচ্ছেন। তাঁর যুক্তি, সাউথ ইন্ডিয়াতে হাসপাতালগুলোতে আই সি সি ইউ-তে ভর্তি রুগিদের মৃত্যু সেপ্টিসেমিয়া-র কারণে হচ্ছে এমন উদাহরণ প্রায় বিরল। কারণ স্টেরিলাইজেশন, অ্যাসেপ্টিক প্রসিডিওর ওরা ঠিক মতো পালন করে। এখানে করা হচ্ছে না। অথচ কলকাতার নামী দামি নার্সিংহোমগুলোর অনেকগুলোর বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ উঠছে।

চিঠিপত্র

মাননীয়
সম্পাদকমণ্ডলী
উৎস মানুষ

গত ২০ নভেম্বর বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে আয়োজিত স্মারক বক্তৃতা আয়োজন করার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি দুটোরই সংমিশ্রণ ঘটেছে।

প্রাপ্তি হিসেবে উৎস মানুষের প্রাণপুরুষ প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করা, তাঁর কর্মকাণ্ডের আভাস পাওয়া এবং অবশ্যই সুন্দরবন নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্রে অশোকদার ভাষ্য শোনা। প্রাপ্তি তালিকায় আছে শিল্পী অনিল মোহন্তর বাঁশিবাদন। এই মানুষটি সম্বন্ধে জানা এবং মানুষগুলির জীবনযাত্রা বিষয়ে অশোকদার ভাবনা-চিন্তা।

তবে প্রাপ্তিকে ছাপিয়ে গেছে অপ্রাপ্তি। অনেক আশা নিয়ে সেই দিনের অনুষ্ঠানে এসেছিলাম। ৭৫টি আসন বিশিষ্ট পূর্ণ সভাঘরে সুন্দরবন নিয়ে তুষার কাঞ্জিলালের বক্তব্যে হতাশ হয়েছি।

তুষারবাবু দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়ায় আছেন, অথচ সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, তাঁদের লড়াই, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা, পরিবেশ ইত্যাদি অনেক কিছুই না-জানা থেকে গেছে। তুষারবাবুর জীবনের অভিজ্ঞতা ও তাঁর দেখা সুন্দরবন নিয়ে অনেক কিছু জানার ও শোনার প্রত্যাশা ছিল। তিনি মূলত সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিধি, অল্প ইতিহাস ও কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন মাত্র। বর্তমানকালে এই সব তথ্য ও ইতিহাস জানাটা খুব একটা কষ্টকর নয়। আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পারিনি সুন্দরবনের গহন অরণ্যের কথা, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের কথা। এই বনাঞ্চলের সারস, জল মুরগী, চিল, বাজ ঘুঘু, শত শত পাখি এবং জলে কুমির, কাঁকড়া, পাইথন ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার যে নামে সুন্দরবন সম্পৃক্ত তাদের কথা। গঙ্গা, মাতলা, ব্রহ্মপুত্র, বিদ্যাধরী, মেঘনা সৃষ্ট বদ্বীপগুলি জুড়ে থাকা সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ ম্যানগ্রোভ অরণ্য পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত বনাঞ্চলের স্বীকৃতি পেয়েছে ইউনেস্কোর কাছ থেকে ১৯৮৫ সালে।

এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাবার কয়েকটি কারণ তুষারবাবু যুক্তি সহকারে ব্যক্ত করেছেন। এই দিনের অনুষ্ঠানে এই বিষয়টাই আমরা ভালভাবে জানতে পেরেছি। ম্যানগ্রোভ

অরণ্যের অস্তিত্ব সংকটের মূলে তার কারণ অনেক। কয়েকটি হল—আবহাওয়ার পরিবর্তন, সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীর প্রবাহমাত্রার হ্রাস, সমুদ্রের জলের লবণাক্ত বৃদ্ধি, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। এর ফলে সংরক্ষিত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে। মেহনার মুখে পলি জমায় নদীর প্রবাহ কমছে, সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ছে, ফলত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া বেহিসেবি বৃক্ষছেদন, চোরা শিকারীদের হাতে বন্যপ্রাণী হত্যা এবং বাসযোগ্য ভূমির খোঁজে ও আবাদি জমি উদ্ধারে বনভূমি শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বনের কাঠ, মধু সংগ্রহ, মাছ ধরা ইত্যাদি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা। আর এই কাজের ফলেই প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে অসংখ্য ম্যানগ্রোভ চারা। খাঁড়ি ও নদীর জল দূষিত হচ্ছে মেসিন চালিত নৌকা ও ট্রলারের জ্বালানি তেলে।

সুন্দরবনের মাটির গঠন ও রাসায়নিক চরিত্রের ক্রমাগত বদল ঘটে চলেছে। যার জন্য মূলত দায়ী মানুষের অজ্ঞতা ও অসচেতনতা। বনাঞ্চলের প্রধান পুষ্টি আসে জলাভূমির গলিত জৈব পদার্থ থেকে। কাদামাটি এইভাবে খাদ্য চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। জল দূষণের ফলে এই পুষ্টি কমছে।

তুষারবাবুর বক্তব্যে এই বিষয়গুলি সেভাবে উত্থাপিত হয় নি। তবে তুষারবাবু ঠিকই বলেছেন যে তাঁর দীর্ঘ ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা মাত্র ৪৫ মিনিটে জানানো সম্ভব নয়। সেই কারণেই হয়তো তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা সেভাবে জানান নি। তুষারবাবু তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন যেগুলি অযথা সময় নষ্ট করেছে এবং যার কোনো প্রাসঙ্গিকতাই ছিল না। যেমন—

১) তিনি চারবার হল্যান্ড গিয়েছেন। সেখানকার সাথে তিনি সুন্দরবনের সরকারি কার্যালয়ের তুলনা করেছেন। ২) গ্রামের যাত্রা শিল্প নিয়ে অযথা মন্তব্য করেছেন। এরই সাথে সাথে কলকাতার শিল্পীদের যাত্রায় অংশগ্রহণ নিয়ে অহেতুক ব্যঙ্গ করেছেন। ৩) গ্রামের শিক্ষকদের সাহিত্য চর্চা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সুকান্ত বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা নাকি গ্রামের শিক্ষকরা চর্চাই করেন না। এ তথ্য তিনি কোথা থেকে পেলেন? ৪) সরকারি ব্যবস্থার ও পরিকল্পনার বিষয়ে নেতিবাচক কথা বলেছেন। আবার রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলীর প্রশংসা করেছেন। ৫) বর্তমান কালের এফ এম রেডিও-র প্রভাতী অনুষ্ঠানের রবীন্দ্রসঙ্গীত বা অন্য রাগাশ্রয়ী গান শোনা নিয়ে অহেতুক তির্যক মন্তব্য করেছেন। ৬) মোবাইল ফোন ও অন্যান্য বেশ কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় তাঁর মূল বক্তব্যের অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছে। তুষারবাবু আইলার ক্ষয়ক্ষতির কথা বলেছেন। সরকারি অপর্যাপ্ত সাহায্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি একবারের জন্যও অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কথা বলেন নি। যাঁরা অনেক অনেক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তুষারবাবু তাঁর কথায় বারংবার সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা ও দর্শনের কথা বলেছেন। তিনি মানুষখে বিজ্ঞানমনস্ক হবার কথাও বলেছেন। অথচ তিনি নিজে প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন।

তুষারবাবু জানিয়েছেন যে তিনি ৫০ বছর ধরে সুন্দবনের রাঙাবেড়িয়ায় সপরিবারে আছেন। কিন্তু তিনি সেখানে কী কাজে যুক্ত আছেন বা তাঁর সংস্থার কোনো পরিচয়ও দেন নি। আমাদের আমন্ত্রণও করেন নি তাঁর কাজ দেখতে যাবার জন্য। এত কিছু পরও বলব যে তুষার কাঞ্জিলালের মতন মানুষের কাছ থেকে সুন্দরবনের কথা শোনা এক বিরল অভিজ্ঞতা। তাঁর মত প্রকৃত মানুষ আমাদের সমাজে এখনও আছেন, যাঁরা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

পরিশেষে উৎস মানুষ কর্তৃপক্ষকে জানাই যে অনুষ্ঠানের শুরুতে কি একটু ফুল দিয়ে অশোকদাকে শ্রদ্ধা জানানো যেত না? এছাড়া তুষারবাবুকে একটা ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানালে বোধহয় ভালোই হত।

সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী

সীতাংশু কুমার ভাদুড়ীর চিঠির উত্তরে তুষারবাবুর বক্তব্য

প্রথমেই আমার বক্তৃতাটি 'মন'যোগ দিয়ে শোনার জন্য সিতাংশুবাবুকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে বক্তব্যটিকে বিচার করেছেন এবং মতামত জানিয়েছেন। সে অধিকার তাঁর আছে। আমি কোনও লিখিত বক্তৃতা দিইনি। এতদিন পরে কি প্রসঙ্গে কি কথা বলেছিলাম তা মনে করা সম্ভব নয়। সমালোচনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কেননা, তা আমাকে সমৃদ্ধ করে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়েই বলতে চাই যে, তা নিয়ে কোনো বাদানুবাদে যাওয়া আমার রুচিতে বাধে। সুন্দরবন সম্পর্কে আমাকে অনেক জায়গাতেই বলতে হয়। সিতাংশুবাবুর আমার কাছে যা প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ করতে আমার একটানা ছয় ঘণ্টা সময় লাগত। প্রসঙ্গের উল্লেখ না থাকায় আমার মনে হয়েছে যে কোথাও কোথাও হয়তো আমার বক্তব্য তার সুন্দরবন সম্পর্কে না জানার কারণে গ্রহণীয় হয়নি। বক্তব্য সুদীর্ঘ না করে শ্রী ভাদুড়ীকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি।

ভবদীয়

তুষার কাঞ্জিলাল

আমি, আপনি এবং আমরা কি সত্যিই ঈশ্বরে বিশ্বাসী?

ষড়ানন পণ্ডা

আমরা কয়েক জন বাল্যবন্ধু এখন সবাই চাকুরি জীবন থেকে অবসর নিয়েছি। আমরা খোস গল্পের আড্ডা জমিয়ে কিছু সময় কাটাই। পরনিন্দা, পরচর্চা, বর্তমানের রাজনীতির কথাও মাঝে মধ্যে ছিটে ফোঁটা এসে পড়ে। বন্ধুদের মধ্যে একজন প্রশ্ন তুললেন, আচ্ছা আমার বাড়িতে তো প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পূজো হয়, প্রতি পূর্ণিমায় হরিবাসরও হয়। বাড়ির সামনে কংক্রিটের হরি মঞ্চের উদ্দেশে হাতজোড় করে কলকাতা, মেদিনীপুর যাই। গ্রামে শ্যামা পূজো, কালিপূজো, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, চন্ডীপূজোও হয় বার্ষিক উৎসব হিসেবে। শীতলা মার মন্দিরে মা শীতলার নিত্য পূজো হচ্ছে। মন্ডপে শিবপূজো হচ্ছে নিয়মিত। এত সবের পরেও মাঝে মধ্যে আবার নিজের কাছেই প্রশ্ন করি আমি কি সত্যিই ঈশ্বরে বিশ্বাসী? সে প্রশ্ন করল প্রশ্নটা আমাদের মনেও জাগে কিনা। আমি যেহেতু সংস্কৃতজ্ঞ, নিষ্ঠাবান পরিবারের সন্তান, তাই আলোচনা আমাকে দিয়ে শুরু করার চাপ এল।

আমি কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নি। ছোট বেলায় পৈতের পর কয়েকটা মন্ত্র মুখস্থ করে ছিলাম, সেগুলো এখনও মুখস্থ আছে। অঅমার শাস্ত্রজ্ঞান ওই পর্যন্তই। যাই হোক চাপে পড়ে প্রি-ইউনার্ভিসিটি ক্লাসে পড়া 'Holy Man' গল্পটার কথা বললাম। পোপের কথায় 'Holy Man' জলকে বিশ্বাস করেছিলেন। এজন্য তিনি জলের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পোপকে হতবাক করে দিয়েছিলেন।

গল্পটা শুনে সবাই পেছনের দিকে চোখ ফেলতে শুরু করলেন। পরস্পরের মধ্যে আমরা আলোচনার পর শেষ সিদ্ধান্তে এলাম, না, আমাদের কেউই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। হরিকে তো সব বাধা বিঘ্ন, আপদ-বিপদ রোগব্যাধি থেকে রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছি। বিশ্বাসটা কিন্তু বড্ড বেশি হাল্কা, যেমনি ছেলেটা অসুস্থ হল তখনি ছুটে গেলাম ডাক্তারের কাছে। বৌমাকে সাপে কাটল, হরিকে বাদ দিয়ে মা মনসাকে পূজোর মানত করলাম। মাইক, জেনারেটর, আতসবাজি, হিন্দি গানে প্রতিবেশিকে অতিষ্ঠ করে ঘটা করে মা মনসার প্রতিমা পূজো করলাম। এই আমার হরিকে বিশ্বাস করার দৌড়! 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' নিয়তির দেওয়া ভাগ্যকে কেউ বদলাতে পারে না। নাতিটা বড্ড রোগা, এটা-সেটা লেগেই আছে। গনক ঠাকুরের কাছে বানালাম কুষ্ঠি। তিনি বললেন, শনি-রাহুর ফাঁড়া কাটাতে হবে। শনিবারে অমাবস্যায় একটা কবচ সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন গলায়। প্রণামীটা কিছু কম নিলেন, মাত্র ৩২৫ টাকা। আমি আপনি সবাই বিধির বিধানকে নাড়াই কবচের জোরে। শহরের শিক্ষিত বাবুরা হাতের আঙুলে বহুমূল্য রত্ন ভরিয়ে নির্ভয়ে বুড়ো আঙুল দেখান বিধিকে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে তাঁর বিধানকে ভেঙ্গে ফেলার জবরদস্ত কেন? আমরা কি বিবেকানন্দকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি? বিবেকানন্দ বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' জীবকে পীড়া দিয়ে তবে কেন ঈশ্বরের পূজো? সে সব মূর্তিকে আমরা মন্ত্রবলে জীবন্ত করে পূজো করি, সেইসব মূর্তি তো মাটি, পাথর বা কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি। ঐ সব মূর্তিতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে তো? এতে প্রাণের স্পন্দনের বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

এখানে আরও একটা প্রশ্ন, রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম বেদ-উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। তিনি বাংলার নবজাগরণের পথপ্রদর্শক। সবাই এক বাক্যে বলবেন, রামমোহন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী গুণী ধার্মির মানুষ ছিলেন। রামমোহন ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কে কি বলছেন দেখা যাক:

"কে ভুলাল হায়, কল্পনাকে সত্য বলি জান
একি দায়?
তাকে কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনও ভূষণ দাও, কখনো আহার
ক্ষণেক স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার!
প্রভু বলি মান যারে, সম্মুখে নাচাও তারে,
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?"

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে—সবাই একমত। কিন্তু মানুষ তার মানবিকতাবোধকে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। সবাই একটা সুস্থ সুন্দর পৃথিবী চায়। এ কাজে নিজেদেরই এগিয়ে যেতে হবে। এই উপলব্ধি আমাদের মধ্যে আসতে হবে।

উমা

সংগঠন সংবাদ

চাউলকুঁড়ি বিজ্ঞান ক্লাবের রোজনামতা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার একটি অখ্যাত গ্রাম 'বালিসীতা', বর্তমান নাম 'চাউলকুঁড়ি'। কোনো দিন কোনো খ্যাতিমান গুণীজনের পায়ের চিহ্ন এই গ্রামে পড়ে নি। কিন্তু বিপদই এনে দিল সম্পদ। দীর্ঘ ২২ বছরের বন্যার দুঃখ ঘোচাতে সুদূর গুজরাট থেকে ছুটে এলেন এম জে নায়ডা। সাপের কামড়ে স্কুল হোস্টেলে কিশোর ভগীরথ মারা গেল। অকাল মৃত্যু যাতে আর কোনও ভগীরথকে ছিনিয়ে নিতে না পারে এ জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছুটে এলেন ডাঃ অমিয় কুমার হাটি (সর্প গবেষক) এবং আরও অনেকে। এতদিন বুক ফুলিয়ে রাজত্ব করেছে অশিক্ষা, দারিদ্র, হাজারো কুসংস্কার। ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের পদার্পণে এখন এলাকার মানুষ সাপে কাটলে আর তুকতাক, তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুক, ওঝাগুনিনের কাছে যায় না। সোজা হাসপাতালে গিয়ে অ্যান্টিভেনাম নেয়; কুকুর কামড়ালে নেয় এ আর ভি। শুধু চাউলকুঁড়ি গ্রাম নয়, সবং, পিংলা, ময়না, নারায়নগড়, পটাশপুর, ভগবানপুর ব্লকে বিজ্ঞান সচেতনতার প্রসার ঘটেছে। এই কাজটি নীরবে করে যাচ্ছে চাউলকুঁড়ি গণ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে ভিক্ষে বা চাঁদা সংগ্রহ না করে, শুধু মাত্র কয়েকজনের শ্রমদানের ওপর ভরসা করেই এগিয়ে চলেছে এই সংগঠন।

আমাদের লক্ষ্য: জীবনের জন্য বিজ্ঞান, মানুষের জন্য বিজ্ঞান, সমাজের জন্য বিজ্ঞান।

১৬ই ডিসেম্বর ২০১০-এ মৌলালি যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল রাজনৈতিক হিংসার বিরুদ্ধে নাগরিক কনভেনশন। 'বন্ধ করে এই রক্তপাত'---এই শিরোনামে ডাকা কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কর্মী, সাহিত্যিক ও আরও বিভিন্ন পেশার মানুষজন। সকলের বক্তব্যের মূল সুর ছিল এখুনি বন্ধ হোক এই খুনোখুনির রাজনীতি। সাধারণ মানুষ ভয় মুক্ত নিশ্চিন্ত জীবন ফিরে পাক। ফোরাম ফর সিভিল লিবার্টিস-এর পক্ষ থেকে ডাকা এই কনভেনশনে তিনটি কর্মসূচি নেওয়া হয়—গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে রক্তপাত বন্ধের আবেদন করা, এবং পাড়ায় পাড়ায় স্বাক্ষর-সংগ্রহ এবং জনমত তৈরি।

হাতিবাগানে চেতনা গণ-সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত ২১তম বিজ্ঞান মেলা হয়ে গেল ২৯ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি ২০১১। এবারে মেলা নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানাপোড়েন চলে। পুরোপুরি অবাণিজ্যিক সংস্থার কাছে বাণিজ্যিক হারে ট্যাক্স চেয়ে পৌরসংস্থার হয়রানি সত্ত্বেও চেতনার সদস্যরা শেষ পর্যন্ত অনুমতি আদায় করতে পেরেছে। হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে আর মেলা করার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ যাত্রায় বিজ্ঞান মেলা উতরে গেল! প্রজাপতি ও মাকড়সা থেকে সাম্রাজ্যবাদ কী ও কেন—আবার সার্ধশতবর্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এমনই সব বিষয় নিয়ে আকর্ষণীয় প্রদর্শনী ওবারেও ছিল, ছিল উৎসাহী মানুষের ভিড়। চেতনার অভিভাবক অমলেন্দু চক্রবর্তীর স্মরণে মঞ্চটিতে উৎস মানুষ জায়গা পায়। তবে সামনের বার বিজ্ঞান মেলা ঘিরে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা থেকেই গেল। আর বিজ্ঞান মেলার অনুমতি না পেলে তা হবে কলকাতার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে আর একটি সৎ প্রচেষ্টার মৃত্যু।

বিজ্ঞান দরবারের বার্ষিক সম্মেলন

১৮ নভেম্বর বিজ্ঞান দরবার সংস্থার ২২তম বার্ষিক সম্মেলন কাচরাপাড়া অ্যালবার্টস স্কুলে (বসন্তবাবু রোড) অনুষ্ঠিত হয়।

বড়জাগুলী আঞ্চলিক গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটির উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এবারও বাৎসরিক ক্রীড়া উৎসব ১৯ ডিসেম্বর ২০১০ গোপাল অ্যাকাডেমির মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ক্রীড়া উৎসবে ছোট থেকে বড় সবাই অংশগ্রহণ করেন।

WB/EC 228 ISSN 0971-5800 R. N. 37275/80 Rs. 15.00

উৎস মানুষ ৩১ বর্ষ জানুয়ারি ২০১১ ১৫ টাকা

পুস্তক তালিকা

ছাপা আছে		ছাপা নেই
১. বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১) সংকলন	৩৫.০০	অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে (সংকলন)
২. যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪০.০০	বিজ্ঞান অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড) স্বাস্থ্যের বৃত্ত
৩. বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন	৪২.০০	প্রমিথিউসের পথে জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?
৪. প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০	শেকলভাঙা সংস্কৃতি - ৪ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান
৫. তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০	সংকলন কী আর কেন
৬. বাংলা বন্‌ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০	চলতে ফিরতে বিজ্ঞানকে মুখোশ করে
৭. এটা কী ওটা কেন সংকলন	৫০.০০	সাপ নিয়ে কিংবদন্তী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ৪
৮. 'আমরা জমি দেই নি, দেব না'	১০.০০	চেনা বিষয় অচেনা জগৎ (জানুয়ারি ২০০০১ম)
৯. আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান সংকলন	৫০.০০	খাবার নিয়ে ভাবার আছে (৩য়) লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি
১০. আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০	নিজের মুখোমুখি ছেচল্লিশের দাঙ্গা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১. প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০	
১২. বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০	

বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪ ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com ই-মেল- utsamanush.manush@gmail.com

কার্যালয় ও চিঠিপত্রে যোগাযোগের ঠিকানা

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬

প্রাপ্তিস্থান

বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (কলেজ স্ট্রীট)।

উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক কলকাতা-৭০০০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তি মুদ্রণ ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, দূরভাষ-৯৪৩৩০৯৯৯৩১ হইতে মুদ্রিত। বাঁধাই- নিবারণ সাহা।